তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী রচনায় শিবরাম চক্রবর্তী

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' — এই মহান বাণী মধ্যযুগের বাংলাসহিত্যে এলেও মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে অদৃশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যদিয়ে মানুষের জীবনে কর্তৃত্ব, অধিকার ও ক্ষমতা (Influence, Authority and Power) -র সংঘর্ষ প্রথমাবধি প্রবহমান। তাই আদি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যেমন দাসব্যবস্থা আবার দাসব্যবস্থা থেকেই ক্রমবিবর্তনের মধ্যদিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় কতিপয় মানুষ কর্তৃত্ব, অধিকার ও ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকে। শাসন-শোষণের তীব্রতায়, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তনে এবং বুদ্ধিজীবী, দার্শনিকদের অনুপ্রেরণায় মানুষ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। ধাপে ধাপে মানুষের অধিকার ও আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে। এছাড়াও ইতিহাসে লক্ষ করা যায় শোষিত বঞ্চিত অসহায় মানুষও শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়েছে। তারই উজ্জ্বল প্রতিভূ স্পর্টাকাস খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ সালে রোমক সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।

রাজার ঐশ্বরিক অস্তিত্ব কিংবা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের একাধিপত্যকে নীরবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মেনে চলবে যুগের পর যুগ, এ তো হতে পারে না। তাই বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে জনগণ বিপ্লবে সামিল হয়েছে বারেবারে। কিন্তু সমাজের নীচুস্তরের সাধারণ জনগণের মধ্যে আত্মচেতনাবোধের জাগরণ সহজ হয়নি। তাই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত দারিদ্রগীড়িত শ্রমজীবী মানুষকে উজ্জীবিত করে বিপ্লবের পথে আহ্বান জানায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সৃষ্ট বুর্জোয়া তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই বুর্জোয়াদের নেতৃত্বেই প্রথম সার্থক আন্দোলন সংঘটিত হয় নেদারল্যাণ্ডে, ১৫৬৬ সালে। স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের শাসন এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এই বিপ্লবের ফলে ১৬০৯ সালে পৃথিবীর প্রথম বুর্জোয়া রাষ্ট্র হলাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপী সময়ে ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য ও চিন্তারীতিতে যে Renaissance বা নবজাগরণ ঘটেছিল তাতেও মানবমুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় দার্শনিক মেকিয়াভেলি (১৪৬৭ - ১৫২৭) ঐশ্বরিক রাষ্ট্রতত্ত্বকে অস্বীকার করে জানিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমাজের বিকাশ ঘটে না, সমাজের পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক কারণে। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মেকিয়াভেলি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁর "The Prince" - এ শাসক এবং শাসিতের মধ্যে দ্বন্দ্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়ে ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বৈষয়িক স্বার্থ এবং ক্ষমতাকে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ টমাস হব্‌স (১৫৮৮ - ১৬৭৯) তাঁর "Leviathan" গ্রন্থে জাগতিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মধ্যযুগে চার্চ, সামন্ত, জমিদার এবং রাজার মধ্যে

ক্ষমতায় যে ধরনের বিভাজন ছিল তাকে অস্বীকার করে, রাজনীতিক চিন্তা থেকে ধর্ম এবং ঈশ্বরের অবসান ঘটিয়ে একান্ত পার্থিব এবং সমানাধিকার বিশিষ্ট মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরী রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন।

আবার হব্‌সের সময়েই ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান কল্পে ১৬৪০ - ৮৯ সালে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত সংগ্রাম হলেও তা'ছিল মূলত উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির বিপ্লব। এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী জমিদার এবং ধর্মযাজক শ্রেণির আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ব্যবসায়ীর অধিকার ও বুর্জোয়ার সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তবু সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সেদিন বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আরও একটি বিষয় তা'হল মানুষ জন্মগত ভাবেই কতকগুলি অধিকার লাভ করে থাকে যা সহজাত অধিকার বলে অভিহিত করা হয়। যেমন জীবনের অধিকার বা বেঁচে থাকার অধিকার প্রভৃতি। এই সহজাত অধিকার মানুষকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনের বুর্জোয়া শ্রেণি পরিচালিত বিপ্লবে এ চিন্তাই বিপ্লবের পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছে যে মানুষের সহজাত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত আইন অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন শুধু নয়, অধিকতর মৌলিক আইন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। অতএব এ-অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। সহজাত অধিকারের প্রবক্তাগণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সহজাত অধিকারের অন্যতম প্রবক্তা জন লক (১৬৩২ - ১৭০৪)। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির সফল সংগ্রাম এবং ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত লক - এর "Treaties on Civil Government" (১৬৯০) গ্রন্থে অধিকারের প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছে। লক - এর মতে এমন কতগুলি অধিকার আছে, যা জন্মগত; অতএব সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সহজাত অধিকার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের নিজ জীবন, কর্মদক্ষতা এবং সম্পত্তির উপর অধিকার। যেহেতু এ-অধিকার জন্মগত অতএব রাষ্ট্রের স্বীকৃতির উপর তা নির্ভর করে না। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বেও অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যেও মানুষ এ অধিকারসমূহ ভোগ করত। এ-অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে। জন লক প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তি প্রয়োগের কথাও ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরেক জন বুদ্ধিজীবী ফ্রান্সের জাঁ - জাঁক রুশোর (১৭১২ - ১৭৭৮) কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর "The Social Contract" (১৭৬২) গ্রন্থে তিনি মানুষের স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা হল রাষ্ট্র কেবল জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এক কৃত্রিম যন্ত্র নয়; রাষ্ট্র হল সামাজিক মানুষের শুভবুদ্ধি, সামগ্রিক স্বার্থে পরিচালিত কর্মে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্থকতা লাভের যে স্বভাবজাত সদিচ্ছা তারই প্রকাশ। গণশক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রুশো গণচেতনার যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। রুশোর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের আরেক জন দার্শনিকের কথা না বললেই নয়, তিনি ভলতের (১৬৯৪ - ১৭৭৮)। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করে মানবমুক্তির বার্তা ছড়িয়ে

দেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রগতিশীল ব্রিটিশ লেখক টম পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) নামও উল্লেখ করতে হয়। জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাঁর রচনা প্রসিদ্ধ। যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিমুক্তির বাণী প্রকাশের জন্য "Rights of Man" ও "The Age of Reason"বই দুটি আজও স্মরণীয়।

'মানুষ মানুষ হয়ে বাঁচবে', 'মানুষ মানুষকে অত্যাচার করবে না', 'সব মানুষই সমান' অর্থাৎ বৈষম্যহীন মানবসমাজের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম দলিলের সূত্রপাত হয় আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের মর্মার্থ এইরূপ —

"এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষের কতকগুলি সহজাত অধিকার আছে, যার মধ্যে জীবনের স্বাধীনতার এবং সুখের অনুসরণ করার অধিকারসমূহ অন্যতম। এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে। যদি কোন সরকার এই অধিকারসমূহ ধ্বংস করে, তবে এই সরকারের বিলোপ সাধন করে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার সৃষ্টি হয়।"[১]

১৭৮৯ সালে যে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তা থেকেও উঠে এসেছে গণতন্ত্রের ভিত্তি ভূমি 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র শর্ত। সারা বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে গণচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ উক্ত তিনটি শর্ত মানবমুক্তির সোপানস্বরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু তখনও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। কী আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, কী ফরাসী বিপ্লব, উভয়ই বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব। তৎসত্ত্বেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে প্রসারিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের চর্চার ফলে যে শিল্প বিপ্লব ঘটে ছিল, তাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবর্তন এলেও শ্রমজীবী মানুষের আত্মিক মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়নি। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রবাহিত মানবমুক্তির স্রোত থেমে থাকেনি। ইংল্যাণ্ডের জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদ দর্শন প্রচার করেছিলেন। হিতবাদ দর্শনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে হিত বা মঙ্গল সাধন (Greatest good of the greatest number)। ইংল্যাণ্ডের আরেকজন হিতবাদী দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) সর্ব সাধারণের শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যহীনতা এবং সমাজে উন্নতির জন্য ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে গণতন্ত্রের ভিতকে মজবুত করেছিলেন। তিনি ফ্রান্সের মনুষ্যত্ববাদী কোমতের (১৭৯৮-১৮৫৭)"Positive Philosophy"পড়ে তাঁর অনুরাগী হয়েছিলেন। এছাড়াও কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও এঙ্গেলসের (১৮২০ - ১৮৯৫) যুগান্তকারী চিন্তাচেতনা, বারট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২ - ১৯৭০)-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, হ্যারল্ড ল্যাস্কির (১৮৯৩-১৯৫০) মানবমুক্তিবাদ ছাড়াও বহু মানবতাবাদী দার্শনিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গণচেতনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের সদিচ্ছার ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

'গণতন্ত্র' শব্দটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্রের সূতিকা ঘর বলে চিহ্নিত প্রাচীন

গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ আজ আর নেই বললেই চলে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনীতিবাদীরা গণতন্ত্র শব্দটিকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। শাসন ব্যবস্থা বা সরকারের রূপ হিসাবে যে গণতন্ত্রের প্রকৃতি বর্তমান, তাই জীবনাদর্শ হিসাবে আজ পরিগণিত হয়েছে। এছাড়াও আদর্শ গণতন্ত্র বা প্রকৃত গণতন্ত্র নামেও গণতন্ত্রের রকমফের বর্তমান। তবে যাই হোক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯ - ১৮৬৫)-এর বিতর্কিত মতটিই মেনে নেওয়া হয় —

''জনগণের মঙ্গলার্থে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত জনগণের শাসন।''

কিন্তু গণতন্ত্র শুধু সরকারের রূপই নয়,জীবনের আদর্শ হিসাবেও বিবেচিত হয়। এই জীবনাদর্শ বা গণতন্ত্রই সকল স্তরের জনগণের সুন্দর ও স্বাধীন জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করতে পারে। সেজন্যই প্রয়োজন গণচেতনা। গণতন্ত্রের প্রকৃতির ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে গণচেতনার তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। সেজন্যই প্রকৃত গণতন্ত্র বা আদর্শ গণতন্ত্রের সন্ধানে আজও বুদ্ধিজীবী মানুষের সচেষ্ট প্রয়াস অব্যাহত। তারই একটি সার্থক প্রয়াস গণচেতনাধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি।

সাহিত্যও একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। তাই প্রায় প্রতিটি বিপ্লবের মধ্যে গণচেতনাধর্মী সাহিত্যের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এমনকি সেই বিপ্লবের পরেও সৃষ্টি হয়েছে গণচেতনাধর্মী সাহিত্য যাতে মানবমুক্তির প্রত্যয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, আরও বৃহত্তর বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। যুগে যুগে স্থান-কাল-পাত্রভেদে শোষণ-শাসনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে যেমন, তেমনই শোষিত-শাসিত মানব সমাজের বন্ধন মুক্তির প্রয়াসেও ছিল পরিবর্তনশীলতা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিদ্রোহীসত্তাকে যে কোনোভাবেই দমন করা যায় না, তা গণচেতনার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত রয়েছে। যার অনন্য নিদর্শন ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিকদের বিপ্লব। তাই শোষণ শাসনে জর্জরিত মানবাত্মার মুক্তি প্রয়াসে নানাভাবে গণচেতনার অপরিহার্যতার প্রসঙ্গ বারে বারেই ফিরে আসে। সাহিত্য গণচেতনা জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তা বলাই বাহুল্য । এই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিক্ষিত জনগণের মাধ্যমে যে গণচেতনার সূচনা হয় তাই-ই কালক্রমে আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তাই বরেণ্য মানবতাবাদী সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মুক্তিকামী জনসাধারণ যে গণচেতনার আলো দেখতে পান, সেই আলোতে নিজেদের অস্তিত্বের সংকটকে যেমন জানতে পারেন,তেমনি তার নিরসনের পথও খুঁজে নেওয়ার সাহস অর্জন করেন। এই মানবতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে পূর্বেই ফ্রান্সের রুশো ভলতেরের নাম করা হয়েছে। এছাড়াও ফ্রান্সের বালজাক (১৭৯৯ - ১৮৫০), ভিক্টর হুগো (১৮০২ - ১৮৮৫) আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪ - ১৯২৪), রোমাঁ রোলা (১৮৬৬ - ১৯৪৪) এবং রাশিয়ার আলেকজান্ডার পুশকিন (১৭৯৯ - ১৮৩৭), আইভান তুর্গেনিভ (১৮১৮ - ১৮৮৩) ডস্টয়েভ্স্কি (১৮২১ - ১৮৮১), লিও টলস্টয় (১৮২৮ - ১৯১০), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৫৮ - ১৯৩৬) ও ইংল্যাণ্ডের চার্লস ডিকেন্স (১৮১২ - ১৮৭০), টমাস হার্ডি (১৮৪০ - ১৯২৮) ছাড়াও জার্মানের

টমাস মান (১৮৭৫ - ১৯৫৫), গ্যেটে (১৭৪৯ - ১৮৩২) প্রভৃতি দার্শনিক-লেখকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণচেতনাই এঁদের রচনার মূল প্রতিপাদ্য। যেহেতু গণচেতনার মধ্য দিয়েই সাধারণ জনগণ নিজেদের অস্তিত্বকে মূর্ত করে তুলতে সমর্থ হয়, সেই হেতু গণচেতনাধর্মী সাহিত্যের সাহিত্য মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য অনেক বেশি হয়ে থাকে।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের কোলকাতাকেন্দ্রিক নগরজীবনে যে নবজাগরণের আবির্ভাব হয়েছিল তাতেও মানবমুক্তির আলোর নিশানা বর্তমান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুদূর প্রসারী শিক্ষার আলোতে, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ - ১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯ - ১৮৩১), বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) প্রমুখ মানবতাবাদীদের সংস্পর্শে ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে একদিকে যেমন সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে গণচেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে স্বপন বসু জানিয়েছেন —

"উনিশ শতকে বাংলায় নতুন এক যুগের এবং সেইসূত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। এই নবযুগের পেছনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথাও স্বীকার্য। অবশ্য প্রতীচ্যভাবই আধুনিকতা নয়, আধুনিকতা আরও ব্যাপক এবং গভীর। তবে পাশ্চাত্যের চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ এদেশে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, নতুন অর্থনৈতিক ও সেইসূত্রে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা ইত্যাদি বাংলার কালপ্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল—যার ফলে বাংলায় নতুন একটি যুগের সূত্রপাত হয়েছিল—ব্যাপারটা সমসাময়িক ব্যক্তিদেরও চোখ এড়ায়নি। সেই কারণেই ১৮২৯-এ রামমোহনপন্থীদের পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রসঙ্গে' বর্তমান সময়কে dawn of a new era বলে অভিহিত করে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রসঙ্গে ইংরেজকে 'য়ুরোপের চিত্তদূত' হিসাবে অভিহিত করেছেন। বাংলায় ইংরেজের আগমনের সুফল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন —

"য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টি ধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার ক'রে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"[৩]

এই নবজাগরণের ফলে সমাজ জীবনে ধর্মীয় সংস্কারান্ধতার কালো মেঘ কেটে গিয়ে মানবতার

বিজয় নিশান তোলার সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষ করা গেল। যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল গণচেতনার বিকাশ। ঐশ্বরিক অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাস, বর্ণবৈষম্যহীন সমাজের কল্পনা, জনমানসে সচেতন আত্মজিজ্ঞাসার উন্মেষ বাংলার এই নবজাগরণের সুদূর প্রসারী ফল যা গণচেতনার প্রাক্ প্রস্তুতির সোপানস্বরূপ।

১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' সিপাহীরা শুরু করলেও ক্রমশ তা কৃষক সমাজের মধ্যেও ছাড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা কারণ চিহ্নিত করলেও এই বিদ্রোহের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে গণচেতনা জাগরণের বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নিত্যপ্রিয় ঘোষ বলেছেন —

"ইংরেজরা যে নতুন কৃষিব্যবস্থা কায়েম করেছিল সেই দুঃসহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল রাজ্যচ্যুত ভূস্বামীরা। কৃষকরা শুধু যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল তা নয়, যেসব জমিদার ইংরেজদের তাঁবেদার হয়ে শোষক শ্রেণীর অংশ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল তাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহে তাদের অংশ গ্রহণের ফলেই সিপাহীদের সাধারণ বিদ্রোহ ভারতবর্ষে একটি জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে বলে অনেকে মনে করেন।"[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬ - ১৯২৬) তাঁর "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" গ্রন্থে প্রথম নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। এর পূর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ - ৫৭), চুয়ার বিদ্রোহ (১৭৭৬), তিতুমীর (১৭৮২ - ১৮৩৯)-এর নেতৃত্বে ওয়াহবি আন্দোলন ও শরিয়তুল্লা (১৭৮১ - ১৮৪০)-এর নেতৃত্বে ফরাজী আন্দোলন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিতুমীর ও শরিয়তুল্লার আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও মূল বিষয় ছিল শোষণ-শাসন ও সামাজিক অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৮৬০ সালে নীলকর বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বাংলার গণচেতনা জাগরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। নীল বিদ্রোহেই প্রথম ভারতবর্ষে গণচেতনাসমৃদ্ধ প্রতিবাদ লক্ষ করা গিয়েছিল। বাংলায় এই বিদ্রোহের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" (১৮৬০) নাটকটি। সাহিত্য যে গণচেতনা জাগরণে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাটকটির ক্ষেত্রে সেই সময়কার জনপ্রিয়তা বা প্রচার-প্রসারই তার প্রমাণ। এর পরেও বাংলা সাহিত্যে গণচেতনার স্বরূপ কী বা গণচেতনাধর্মী সাহিত্যের বিকাশ কীভাবে হয়েছে—এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েই যায়।

৩

বেশির ভাগ সময়ই অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির ফলে নবসৃষ্ট শব্দের সম্যক অর্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে

না। ফলে শব্দটির যথার্থ স্বরূপ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাজনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পরিবর্তিত হয় । এই দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যই জটিলতার সৃষ্টি করে। মতানৈক্যর ফলে যেমন একদিকে শব্দটির বিষয়ের পরিসর ক্রমশই পরিবর্তিত হয়, তেমনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। এরকমই একটি প্রচলিত শব্দ 'গণচেতনা'র 'গণ'অংশটির ব্যাপ্তি বিষয়ে ঐকমত্যের অভাব লক্ষ করা যায়। স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে স্বরূপ-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যই এর মূলকারণ। সুব্রত রুদ্র তাঁর ''গণসংগীত সংগ্রহ'' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন —

''অধিকার সচেতন, শ্রেণী সচেতন, শ্রেণী চেতনার উদ্বুদ্ধ মানকেই বলা যায় গণ।''[৫]

আবার ''বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা'' গ্রন্থের ভূমিকায় ড. দীপক চন্দ্র বলেছেন —

'' 'গণ' শব্দটি প্রকাশ করল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং তাদের বাঁচার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামীরূপকে।''[৬]

একদিকে বিশেষ এক শ্রেণির মানুষকে, অন্যদিকে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষের সংগ্রামীরূপকের আধারে 'গণ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। আবার গণআন্দোলন, গণসমাবেশ, গণনায়ক, গণনাট্য ইত্যাদি শব্দের প্রথমে 'গণ' অংশটির সহাবস্থানে অর্থের পরিসরের প্রকৃতি ও বিষয়ে ঐকমত্যের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। প্রাবন্ধিক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে'' গ্রন্থের 'বাংলা ছোটগল্পের কাছে প্রত্যাশা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'গণ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ বিষয়ে আক্ষেপ করে লিখেছেন —

''এ কথাগুলো বলতেই হচ্ছে গণসাহিত্য, প্রগতি সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকের ছেলেমানুষী ধারণার নিদর্শন দেখে। তাদের কে বোঝাবে, গণধোলাই যে অর্থে 'গণ', গণসাহিত্য সেই অর্থে কিন্তু 'গণ' নয়।''[৭]

'জন' ও 'গণ' দুটি শব্দেই মানুষকে বোঝালেও জনচেতনার সঙ্গে গণচেতনার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। প্রথমটি সামাজিক এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। আবার সমাজসচেতনার সঙ্গে গণচেতনার স্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্মতা নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ উভয়ের মধ্যেই মানুষের সচেতনতার বিষয়টি বর্তমান। 'গণ' অর্থে আবার শ্রেণিকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকে । এই শ্রেণি, শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণিসংগ্রাম তিনটি একই সূত্রে গ্রথিত, সামাজিক কাঠামোর একটি অনিবার্য দিক এবং ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। শ্রেণির সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্কই এর মূলকথা। এ ধারণা মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের মত অমার্কসীয়দেরও। শ্রেণি সম্পর্কে লেলিন বলেছেন —

"Classes are groups of People, one of which an appropriate the labour of another owing to different places they occupy in a definite system of social economy."[৮]

আবার ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন —

"Class when (1) a number of people have in common a specific causal component of their life chances, in so far as (2) this component is represented exclusively by economic interests in the possession of goods and opportunities for income"[৯]

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় তাহল 'গণ' শব্দের সঙ্গে 'জন' শব্দের মতো 'লোক' শব্দটিও প্রচলিত থাকলেও এবং গণসাহিত্য বা জনসাহিত্য, জনগণের সাহিত্য ও লোকসাহিত্য এক মনে হলেও তিনটিই স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা। আবার একই সঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন এসেই যায় যে, গণসাহিত্যই গণচেতনাধর্মী রচনা কিনা। সেজন্য গণচেতনাধর্মী রচনা বলতে এখানে কোন ধরনের সাহিত্য রচনাকে বিবেচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাহিত্য সমালোচক কমলকুমার সান্যাল জানিয়েছেন —

"গণচেতনাধর্মী সাহিত্য বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন সেই ধরনের সাহিত্য যা নগর সভ্যতার বাহিরের জনপদ জীবন অবলম্বন করে লেখা। এই ধরনের সাহিত্যে গণচেতনার প্রকাশ আংশিক। গণচেতনাধর্মী সাহিত্য বলতে সেই ধরনের সাহিত্যকেই বুঝায় যে সাহিত্য শ্রেণীসচেতন, যা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, যা ঘুণধরা গলিত সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে লিপ্ত, অন্যায়-অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা, মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা, নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতি বর্ণিত হয়।"[১০]

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, এই ধরনের সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের অবস্থান বিষয়ে। কারণ লেখক যাদের জন্য লিখেছেন তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞানহীন। লেখকের মূল লক্ষ্য তাদের কাছে অজানা রয়ে যায় যদি না মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগণ পাশে এসে না দাঁড়ায়। দরদি শিল্পীর সযত্নে সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব তাই অনেক সময় কিংবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতিপয় শিক্ষিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে 'দেশ'-এর এক সম্পাদকীয়তে ভারতীয় সমাজে সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে লেখা হয়েছে —

"পরিসংখ্যান এদেশের সাক্ষরদের যে সংখ্যা প্রদান করছে তাতে বোঝা যায় এখনও এদেশের বেশির ভাগ মানুষই অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে আছে। যারা সাক্ষর তারা হয়তো বর্ণমালা চেনে বা নিজের

নামটি স্বাক্ষর করতে পারে। পঠনপাঠনে দড় এমন মানুষের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় ভয়াবহ অনুপাতে কম।

শিক্ষাদীক্ষার যখন এই হাল তখন সাহিত্যপাঠকের সংখ্যা যে অঙ্গুলিমেয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং সাহিত্যের এমন সাধ্য নেই যে, গল্প-উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে গণচেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে পারে।''[১১]

এই যদি হয় একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের চিত্র, তবে বিংশ শতাব্দীর পূর্বের অবস্থা আরও সঙ্গীন ছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অবশ্য সম্পাদকীয়তে এও জানানো হয়েছে —

''দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শিক্ষিত সমাজও যে সাহিত্য-সচেতন এমন মনে করার কারণ নেই।''[১১]

অবশ্য শিক্ষিত সমাজে সচেতনা বৃদ্ধি করাই তো এধরনের সাহিত্যিকের প্রকৃত লক্ষ্য নয়—যদিও সাহিত্যের আলোড়ন তাদের মাধ্যমেই প্রথমে হয়ে থাকে। কিন্তু যাদের গণচেতনা জাগ্রত করতে সাহিত্যিক প্রয়াসী হন তারা যদি শিক্ষার আলোতে নিজেদের দেখতে না পায়, তাহলে মূল লক্ষ্য বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্র দাসগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখেরা গণসাহিত্য স্রষ্টাদের অবস্থান বিষয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনই গণচেতনাধর্মী সাহিত্যিকদের নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। প্রায় অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী, তাই বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী রচনার মধ্যে দেখতে হবে সাহিত্যিক কোন বিষয়ে কীভাবে গণচেতনা জাগরণে প্রয়াসী হয়েছেন। শ্রেণি বৈষম্যমূলক সমাজে গণজীবনের অবস্থানজনিত সংকট এবং তার জন্য অধিকারবোধ জাগ্রত করার প্রয়াসের মধ্যে গণচেতনাধর্মী রচনার প্রকৃতি নির্ভর করে।

'গণচেতনা' শব্দটির উদ্ভব খুব বেশি দিনের না হলেও বাংলা গণচেতনাধর্মী সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল, সে কথার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয়চেতনার মোড়কে সমাজচেতনার প্রকাশ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথমাবধি লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত ''মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী'' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে জয়া সেনগুপ্তা দেখিয়েছেন শাসকশক্তির প্রতি শাসিতের প্রতিরোধ এবং নারীশক্তি বা নারী সচেতনতার উন্মেষ ও পূর্ণবিকাশ কীভাবে মনসামঙ্গল কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে।[১২] সমালোচক মোহাম্মদ হাননান তাঁর ''বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঃ মনসামঙ্গল কাব্য'' গ্রন্থে শ্রেণিচেতনাঋদ্ধ শ্রেণিদ্বন্দ্বের চেহারাকে তুলে ধরেছেন।[১৩] মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনের ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে মানুষের কাছে মুদ্রিত বইয়ের সহজ লভ্যতা বেড়ে যাওয়ায় গণচেতনা জাগরণের দ্বার খুলে গেল। কিন্তু তাই বলে তখন থেকেই সাহিত্যে গণচেতনার

সূচনা হয়নি। একদিকে অনুবাদাদি ও মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস, অন্যদিকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা চলেছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে লক্ষ করা গিয়েছিল।

গণচেতনা জাগরণের প্রয়োজনে সাহিত্যপ্রয়াস ব্যক্তি-সমাজ-ধর্ম নিরপেক্ষ কতিপয় মানুষের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধিকার চেতনার পথ ধরে এসেছিল। পূর্বেই উল্লেখিত দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০ - ১৮৭৩) "নীলদর্পণ" (১৮৬০) নাটকেই প্রথম যথার্থ গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। অবশ্য এর পূর্বেও অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০ - ১৮৬৬) ১৮৫০ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে লেখকের নাম উল্লেখ না করে প্রকাশিত 'পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' নামক রচনায় প্রজাদের উপর জমিদার ও তার অধস্তন কর্মচারীর নির্মম শোষণ ও শাসনের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তাতে কিন্তু মানুষের দুরবস্থাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে প্রতিকার বা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তির প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। তাই তা গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায় উন্নীত হতে পারেনি। কিন্তু রচনাটি বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী রচনার প্রথমদিকের প্রয়াস হিসাবে স্মরণ করা যেতেই পারে।

"নীলদর্পণ" নাটকেই প্রথম গণচেতনার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে নাটকটির প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন —

"১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে "ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই"? ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।"[১৪]

প্রসঙ্গত স্মরণীয় "নীলদর্পণ" নাটকের প্রথম প্রকাশকালে দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না। লেখকের নামের ক্ষেত্রে লেখা ছিল — "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্"।[১৫]

শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন —

"এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল ; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পহেলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।"[১৬]

অবশ্য শিবনাথ শাস্ত্রী এও জানিয়েছেন —

"নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ এই ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গ সমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়ের আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে একপ্রকার উত্তেজনা চলিতেছিল।"[১৭]

কিন্তু "নীলদর্পণ" নাটকের সমাদরের কারণ হিসাবে চিহ্নিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য তা পূর্বের নাট্যপ্রয়াস লক্ষ করলেই বোঝা যায়। ১৭৯৫ সালের নান্দীপাঠ থেকে শুরু করে ১৮৬০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের উত্তরণে অনুবাদ ও মৌলিক নাটকের উপস্থিতি বর্তমান। এমনকি "নীলদর্পণ" নাটকের পূর্বে বছর কয়েকের মধ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয়ও হয়েছিল। কোলকাতায় আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" (১২৬২) নাটক অভিনীত হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুয়ারি। এরপরে রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) "কুলীন- কুল সর্বস্ব" (১৮৫৪) ও "বেণীসংহার" (১৮৫৬) নাটকের অভিনয় হয়েছিল যথাক্রমে রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ সালে। কালীপ্রসন্নের স্বরচিত "বিক্রমোর্বশী" নাটকের অভিনয়ও হয় ১৮৫৭ সালে বিদ্যুৎসাহিনী সভায়। এপ্রসঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদ সুকুমার সেন জানিয়েছেন —

"তাহার পর বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বোধকরি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা বেলগেছেয় পাইকপাড়ার রাজাদের বাগানবাড়িতে রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটক ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় (১৮৫৮-৫৯)।"[১৮]

এছাড়াও "নীলদর্পণে"র প্রায় বছর দেড়েক পূর্বে উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবা বিবাহ" নাটক 'সিঁদুরেপেটীতে তখনকার মেট্রোপালিটন কলেজ গৃহে' অভিনীত হয়েছিল ১৮৫৯ সালের ২৩ এপ্রিল।[১৮] এমনকি "নীলদর্পণে"র পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের "কৃষ্ণকুমারী" (১৮৬১) ও রামনারায়ণ তর্করত্নের "নবনাটক" (১৮৬৬) যথাক্রমে শোভাবাজার রাজবাড়ি ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়েও সেরকম ভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি।

আসলে দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" সেই নাটক যে নাটকের মধ্যে সেই সময়ের দেশের মানুষ নিজেদের করুণ অবস্থান উপলব্ধি করতে পেরেছিল। গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজের যে দুর্বিষহ প্রাণান্তকর দুরবস্থার চিত্র নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত হওয়ায় গণচেতনা জাগরণে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। সুকুমার সেনের ভাষায়—

"দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক-শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্যনামিক মানুষের বর্বর অন্তর উদ্‌ঘাটিত হইল। নীলদর্পণে সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যেমন সাড়া পড়িয়াছিল তেমনটি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই।"[১৯]

নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষও নাটকটির প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন —

" "নীলদর্পণ" বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইহা যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার তুলনা অন্য কোথাও আমারা দেখি নাই। নীলকর-অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যখন নিরুপায় জনসাধারণ দুঃখের অন্ধকারে তাহাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তখন 'নীলদর্পণ' তাহাদের সম্মুখে অগ্নিবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল। সেই অগ্নিতে সেদিন জনগণের প্রথম দীক্ষা হইয়া গেল, সেই অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল দেশের প্রান্ত ও প্রান্তরে। অত্যাচারের লেলিহ জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।"[২০]

প্রায় একই সুরে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন —

"স্বাদেশিক গণ-আন্দালনেরও ভিত্তিভূমি এই নাটক। নীলকর-সাহেবদের কোপে পড়ে গোলক বসুর সম্পন্ন নিরীহ পরিবার এবং সাধুচরণ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্র রায়তের বংশ কীভাবে ধ্বংস হল , উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা নিরীহ গ্রামবাসীর অসহায়তা এবং বিচারবিভাগের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার সুযোগে কীভাবে পশুবৎ আচরণ করত, এমন কি গর্ভিনী রমণীও তাদের পশুদৃষ্টির ঘৃণ্য ক্ষুধা থেকে বাঁচতে পারত না—তারই অতি কঠোর ও বাস্তবচিত্র এঁকে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের নতুন পথ খুলে দেন, বাংলা স্বাদেশিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গ্রাম্য নরনারীর দুঃখনির্ভর ও নির্যাতন-পীড়িত অসহায় অবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কন করেন এবং বাক্‌রীতি ও সংলাপে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী পরিপূর্ণ বাস্তব-জীবনের ভাষা ব্যবহার করে বাংলা নাট্যকারদের মধ্যমণি বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।"[২১]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার নাটকটির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন —

" The sad and disgraceful story of the indigo cultivation in Bengal cannot be concluded without reference to a tragic episode. Mention has been made above the drama, 'Nil-darpan' (Mirror of indigo), written in Bengali by Dinabandhu Mitra, a high Government official. The popularity of the book roused the interest even of Europeans, several of whom expressed a desire for an English translation." [২২]

"নীলদর্পণ" নাটকটির স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—

" 'নীলদর্পণ' কিন্তু এদেশের জনমানসগঠনে ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'নীলদর্পণ' সমকালীন আর পাঁচটি সমাজ সংস্কারমূলক নাটকের অনুরূপ নয়। এর মধ্যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নকে উদ্যত করে তোলা হয়েছে।"[২৩]

তিনি আরো লিখেছেন —

"বিংশ শতকের পূর্বে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রতি অপর কোন নাটকই এত বড় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাছাড়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নিস্তরঙ্গ বিবর্ণ জীবন-কথা এড়িয়ে তিনি অস্ত্যর্থক জীবনাবেগ খুঁজেছিলেন বাংলার কৃষকদের মধ্যে, গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে তাঁর প্রথম নাট্যকাহিনীকে স্থাপিত করেছিলেন।"[২৪]

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৩-১৮৯৮)ও নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন—

"নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"[২৫]

সুকুমার সেন একই কথা একটু অন্য ভাবে বলেছেন —

"পাপপ্রতিষেধক রচনা বলিয়া 'আঙ্কল টম্‌স্ ক্যবিন', 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বি' ও 'অলিভার্ টুইস্‌ট্' ইত্যাদির পাশে নীলদর্পণের স্থান। দেশ-বিদেশের "পুণ্যবান" সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধুও একজন।"[২৬]

যেভাবেই হোক, যে অভিধাতেই হোক, "নীলদর্পণ" একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক এবং গণচেতনা জাগরণে সহায়ক—এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই বললেই চলে। নাট্যকার শোষিত বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র মানুষের ভিতরকার বিপ্লবীসত্তার জাগরণের জন্য এই অভিনব নাট্যরূপায়ণ করেছেন। শাসিত ও শোষিত মানুষের চেতনার দ্বার খুলে দিয়েছিল এই নাটক। আর সে জন্যই ড. শ্রীমন্তকুমার জানা বলেছেন —

"দীনবন্ধু ছিলেন বাস্তববাদী খাঁটি বাঙালী নাট্যকার। কর্মব্যপদেশে তাঁকে বাংলার বহু জেলায় ঘুরতে

হয়েছে। চোখের সামনে তিনি অত্যাচারের নির্লজ্জরূপ ও অশ্রুমথিত মানবতার বিপর্যয়, হাহাকার দীর্ঘশ্বাস প্রত্যক্ষ করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নিষ্পেশিত জনজীবনের যন্ত্রণাকে তিনি সর্বব্যাপীন সহানুভূতি দিয়ে শুধু পরিস্ফুট করেন নি,—সংগ্রামী চেতনায় তাকে বহ্নিদীপ্ত করে গণমুক্তির বাণী রচনা করলেন। আজকাল যাকে গণসাহিত্য বলা হয়, সেই গণচেতনা, গণবিদ্রোহ ও গণমুক্তির তিনি প্রথম যথার্থ মন্ত্রোদ্‌গাতা।''[২৭]

''নীলদর্পণে''র মতো সাড়া জাগানো না হলেও মীর মশারফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) ''জমিদার দর্পণ'' (১৮৭৩) নাটকটির মধ্যে গণচেতনা জাগরণের যথেষ্ট রসদ ছিল। অজিত কুমার ঘোষ নাটকটিকে 'সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে লিখিত দুঃসাহসিক বাস্তবধর্মী নাটক' বলে অভিহিত করেছেন।[২৮]

'এরূপ একখানি বাস্তব সমস্যামূলক সামাজিক প্রতিবাদের নাটক এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছিল কেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছে' সাম্প্রতিককালের নাট্যানুরাগী সমাজ সেকথাও সমালোচকব্যক্ত করেছেন। শুধু ইংরেজ নীলকরই যে শোষণ ও শাসনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, দেশীয় জমিদারেরাও পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সব রকম পন্থা অবলম্বন করায় ও ক্ষমতার পৈশাচিক তাণ্ডবে প্রজাদের সর্বস্ব ধ্বংস করে ভিটেছাড়াতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তারই দলিলস্বরূপ ''জমিদার দর্পণ''। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করায় জমিদারের যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার।

এরপরে নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) ''পলাশীর যুদ্ধ'' (১৮৭৫) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''আনন্দমঠ'' (১৮৮২)-এর মতো জনপ্রিয় স্বদেশচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনা প্রকাশিত হলেও গণচেতনাধর্মী সাহিত্যের সেরকম নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''সাম্য'' (১৮৭৯) গ্রন্থটি উল্লেখ্য। প্রথম সংস্করণের পর ''সাম্য'' শীর্ষক গ্রন্থটির বিলুপ্তি করলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধটি ''বিবিধ প্রবন্ধ'' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। নারীসমাজের প্রতি অন্যায় অবিচার, জমিদারকুল ও তাঁদের অজান্তে অধস্তন কর্ম চারীদের নির্মম অত্যাচারের কথা ''সাম্য''-এর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সুনিপুণ ভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। আবার 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১২৭৯) প্রবন্ধে অর্থনৈতিক সামাজিক প্রাকৃতিক আইনগত পরিকাঠামোর মধ্যে আনুপূর্বিক বাংলার কৃষকসমাজের প্রকৃত দুরবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধিকে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হিসাবে মেনে নিতে চাননি। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি এবং শ্রীহীন অবস্থায় সঙ্গীন জীবনযাপন করছে। তাই বলে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত, অসহায় কৃষক সমাজের প্রতিনিধি পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্ত ও হাশিম শেখদের সমস্যা দূরীকরণের জন্য শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা বলেননি বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সময়ের জমিদার শ্রেণির উপরেই তাঁর আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন —

''তবে পাছে জমিদার সম্প্রদায় তাঁদের সত্য-উদ্‌ঘাটনে তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন এই জন্য

মাঝে মাঝে জমিদার সমাজের উপর কিছু প্রশংসার গঙ্গোদক ছিটিয়েছেন।''[২৯]

অবশ্য বঙ্কিমের সাম্যনীতি তৎকালীন সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন—

''বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি রুসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত।''[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের ''কমলাকান্তের দপ্তর'' (১৮৭৫) - এর 'বিড়াল' রচনাটিতে সাম্যবাদের প্রসঙ্গটি উল্লেখনীয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্তধারায় বিচরণকারী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ''চিত্রা'' (১৮৯৬) কাব্যের 'এ বার ফিরাও মোরে' কবিতায় সাধারণ জনগণের 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা ও 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা জাগানোর জন্য যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তার পরিচয় কিন্তু অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। ''চিত্রা'' কাব্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের শাসন ও শোষণের একটি ছবি রয়েছে বটে কিন্তু সেখানেও গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস নেই বললেই চলে। ''চৈতালী'' (১৮৯৬) কাব্য থেকে বেশি করে কবি মানবমুখী হয়েছেন। ''কাহিনী''র (১৯০০) 'দীনদান', ''নৈবেদ্য''র (১৯০১) ৬৪ নং কবিতা, ''খেয়া'' (১৯০৬) পর্যায়ের একাধিক কবিতা এবং ''গীতাঞ্জলি''র (১৯১০) ১০৮ নং ইত্যাদি কবিতার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ গণশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন তাঁর ''শিক্ষা'' (১৯০৮) গ্রন্থের মধ্যে। কারণ যথার্থ শিক্ষাই দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের কল্যাণের চাবিকাঠি। পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ গণচেতনা জাগরণের কথা বললেও গণজীবনের কথা অব্যক্তই রয়ে গেছে। ১৯৩১ - ১৯৪১ সাল পর্যন্ত অন্তিম জীবনের দশবছর রবীন্দ্রনাথ মানবমুক্তির অনেক কথাই বলতে চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী সাহিত্যচর্চায়ও এগিয়ে এসেছিলেন উদার ধর্মপ্রাণ বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২)। তাঁর লেখনী শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে গণচেতনা জাগরণের জন্য। প্রখ্যাত সাহিত্যসেবক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের রচনাবলীর উৎস হিসাবে স্বদেশশ্রম ও স্বজাতি হিতৈষণাকে চিহ্নিত করে বলেছেন —

''বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ অনলস, অতন্দ্রিত ভাবে কর্মের সাধনা করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত এবং তাঁহার সাহিত্যসাধনাও ছিল সেই কর্মসাধনারই অন্তর্গত।''[৩১]

উদাত্ত আহ্বানে আকর্ষণীয় তথা যুক্তিনিষ্ঠ ভাষণের মাধ্যমে স্বামীজি জনসাধারণের অন্তর্মানসকে যেভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন, তেমনই কথ্যভাষায় মানবমুক্তির প্রয়োজনে গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায় তৎপর হয়েছিলেন। অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্য বিস্তারের কথা যেমন বলেছেন, তেমনই বর্ণভেদের শিকারগ্রস্ত অন্ত্যজ শূদ্রশক্তির ক্রমশ উত্তরণের কথাও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনন্য বিশ্লেষণশক্তি ও সুগভীর উপলব্ধির সমন্বয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশেষকরে ''বর্তমান ভারত'' বইটির মধ্যে। নররূপে নারায়ণের উপস্থিতিই বিবেকানন্দ বারেবারেই উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সাহিত্যে।

স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) বছর খানেক আগে ইংরেজের শাসন ও শোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশিত স্বদেশচেতনার আড়ালে গণচেতনাধর্মী একটি বই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বদেশী যুগের নামকরা প্রাবন্ধিক সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯ - ১৯১২) রচিত বইটির নাম ''দেশের কথা'' (১৯০৮)। এছাড়াও তাঁর আরেকটি বই ''কৃষকের সর্বনাশ'' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯ - ১৯৭৬) পূর্বেই যে কবির কবিতায় গণচেতনা জাগরণের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের ''কবিতা সংগ্রহ''-এর ভূমিকায় সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছেন—

''সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার মূলে দ্বিতীয় অন্যতম প্রেরণা হল শ্রেণী-শোষণ-কলঙ্কিত প্রত্যক্ষ সমাজ-ব্যবস্থা ও পদদলিত মানুষ। তাঁর পূর্বেই অবশ্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রের উচ্চারণে হীনীকৃত ও শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকারের দাবি ঘোষিত হয়েছে। তবু আরও বিস্তারিতআরও স্পষ্ট কথনের আবশ্যকতা ছিল। আধুনিক জাতিমানসের সেই গুরত্বপূর্ণ প্রয়োজন নির্বাহ করলেন রবীন্দ্রসমকালেই সত্যেন্দ্র নাথ ও নজরুল। এইদিক থেকে রবীন্দ্র-সহচর কবি-পর্যায়ের মধ্যে এঁরা সেকালের এবং একালেরও প্রগতিকামী জনজীবনের একান্ত ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ।''[৩২]

নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ ঘোষণা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখা দিয়েছিল —

কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ ক'রে।
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্‌তে খাটো,
হামবড়াই-এর সংহিতা কোড্ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো
সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে
কার কাছে তুই নোয়াস্ মাথা, ত্রস্তচোখে কম্পদেহে?

('আখেরী', ''বেলা শেষের গান'')

একাধিক কবিতায় সমাজের নারীর জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তুলেধরে নারীমুক্তির এক অগ্রণী কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ গণচেতনা জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ''তুলির লিখন'' (১৯১৪), ''বেলা শেষের গান'' (১৯২৩), এবং ''বিদায় আরতি'' (১৯২৪) প্রভৃতি কাব্যের অনেক কবিতাতেই নারীজীবনের করুণ কাহিনীর ইতিবৃত্তে নিষ্ঠুর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাতে গণচেতনা নয়, সমাজচেতনাই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণভেদের যাঁতাকলে পিষ্ট মানবাত্মার মুক্তির জন্য একদিকে স্পষ্ট ভাষায় তার বিরোধিতা করেছেন, অন্যদিকে মানুষের মানবিকতার উপর জোর দিয়েছেন। আবার একদিকে শ্রমিকের প্রতি মালিকের অমানুষিক শোষণ, অন্যদিকে কৃষকের প্রতি ভুস্বামীর অপরিসীম ভোগসর্বস্ব পাশবিক মানসিকতার ছবিও এঁকেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। গণচেতনা জাগরণে সচেষ্ট হয়ে বিদ্রোহী মানবাত্মাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে সত্যেন্দ্রনাথকে 'শ্রেষ্ঠ মানুষের কবি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ''হোমশিখা'' (১৩১৪) র 'সর্বংসহা', 'সাম্যসাম', ''কুহু ও কেকা'' (১৩১৯) - র 'শূদ্র', 'মেথর', ''অভ্রআবীর'' (১৩২২) - র 'জাতির পাঁতি' এবং ''বেলা শেষের গান'' (১৩৩০) - এর 'আখেরী' প্রভৃতি কবিতায় গণচেতনার রূপটি ফুটে উঠেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পরে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭ - ১৯৫৪) কবিতাতেও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মনে করেন —

''নঙর্থকভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যাহা রোমান্টিক বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা অস্ত্যর্থকভাবে তাহাই তাঁহার বলিষ্ঠমানবিকতা। মানুষের উপরে গভীর শ্রদ্ধার আনুষঙ্গিক রূপেই দেখা দিয়াছে মানুষের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আস্থা। স্বর্গের দেবতাকে যদি তিনি তাঁহার কাব্যে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা মর্তের মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্য।''[৩৩]

সমালোচক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন। তাই তো যতীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় —

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুঃখ-পথ-যাত্রী।

('দুঃখবাদী', ''মরুশিখা'')

মানুষের প্রতি মানুষের নির্মম শোষণ-শাসনের প্রতি কবি তীব্র ধিক্কার ও উপহাস যেমন প্রকাশ

করেছেন, তেমনই অসহায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতি জানিয়েছেন সমবেদনা। তাঁর "মরীচিকা" (১৯২৩), "মরুশিখা" (১৯২৭),"মরুমায়া" (১৯৩০) প্রভৃতি কাব্যের অনেক কবিতা পরোক্ষভাবে গণচেতনা জাগরণে সহায়তা করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচক দিলীপ সাহা বলেছেন —

"নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতায়, দুঃখহত দীন দরিদ্রের প্রতি নিবিড় বেদনাবোধে উৎসারিত এই দৃপ্ত ঘোষণায় যতীন্দ্রনাথ গণকবির মর্যাদা লাভ করেছেন।"[৩৪]

কিন্তু সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে এও জানিয়েছেন —

"তবে নজরুল ইসলামের আগে এঁদের কেউই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা কাব্যে ঘোষণা করেন নি।"[৩৪]

বাংলা সাহিত্যে যে কবি গণচেতনা জাগরণের মাধ্যম হিসাবে কবিতাকে ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোহী আত্মার বলিষ্ঠ প্রতিভূ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। শুধুমাত্র একটি কবিতা 'বিদ্রোহী'র (প্রথম প্রকাশ ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিজলী' পত্রিকায়) মাধ্যমে বাংলার মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনার সূচনা করেছিলেন তা ছিল বাংলা সাহিত্যে এক বজ্রনির্ঘোষ। কবির লেখনীতে ঝলসে উঠেছিল মানবমুক্তির বার্তা —

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

('বিদ্রোহী', "অগ্নিবীণা")

তাই পরিমল গোস্বামী তাঁর "আমি যাঁদের দেখেছি" গ্রন্থে জানিয়েছেন —

"অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোনো বাঙালী কবি চ্যালেঞ্জ জানান নি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে শুনি নি। Must fight to the finish মন্ত্রে দীক্ষিত আর কোনো বাঙালী কবি শত্রুপক্ষকে এমন আহ্বান জানাননি।"[৩৫]

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে যে গণচেতনার অভিব্যক্তি স্পষ্ট ঘোষণার মধ্যে নিহিত ছিল, তাই সুস্পষ্ট করে, আবেগময়ী ভাষায়, দরদি উপস্থাপনায় উজ্জীবিত করেছেন পরবর্তী অনেক কবিতায়। পল্টনের সৈনিকজীবন

(১৯১৭-১৯১৯) রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭), তুর্কি নবজাগরণ ও দেশের অসহযোগ আন্দোলন এবং মার্কসবাদী সংগঠক মুজফ্‌ফর আহমদের (১৮৮৯ - ১৯৭৩) সংস্পর্শ প্রভৃতি নজরুলের কবিচেতনায় গণচেতনার বিষয়টি সঞ্চার করেছিল। সুকুমার সেনের মতে —

"অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটুকু আলো, যতটুকু ভালো, যতটুকু মুক্তি আনিয়াছিল তাহা নজরুলের কবিতা-গানের দ্বারা অনেক অংশে সম্ভাবিত হইয়াছিল। নজরুলের কবিতার ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের উচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্তে যে বিস্ফার সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার মূল্য সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী সাহিত্যের পক্ষে তুচ্ছ নয়।"[৩৬]

যেখানে এবং যখনই মানবমুক্তির প্রতিবন্ধকতা উপলব্ধি করেছেন, সেখানেই এবং তখনই লেখনী চালনা করে গণচেতনা জাগরণে প্রয়াসী হয়েছেন সাম্যবাদী নজরুল। গবেষক শিশির কর লিখেছেন —

"পরাধীনতার লাঞ্ছনা, অসহ্য দারিদ্য ও দুঃখকষ্ট, সমাজের ভণ্ডামি, ধর্মের ও রাজনীতির নামে অসংখ্য রকমের শোষণ কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই কবিতা হয়ে উঠেছিল শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। তিনি যথাযথ জনগণের কবি। রাজনৈতিক, সামাজিক - সবকিছু অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সবকিছু শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।"[৩৭]

এই মন্তব্যর সমর্থন পাওয়া যায় মুজফ্‌ফর আহমদের স্মৃতিকথায়। তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—

"নজরুল শুধু শিক্ষিত-সমাজে কাব্য-চর্চা করত না। তার পরিচয়ের পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আমি দেখেছি, তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্যে চটকলের বাঙালী মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের ভিতরেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ, শুধু শিক্ষিত সমাজের গণ্ডির ভিতরে সে নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেছে জনগণের মধ্যেও। এই জন্যেই বাঙলা দেশের কবিদের ভিতরে নজরুল ইস্‌লাম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিল।"[৩৮]

বোঝাই যাচ্ছে, গণচেতনা জাগরণে নজরুলের সক্রিয় ভূমিকার কথা।

দুঃখ-দারিদ্রপীড়িত বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কবি নজরুল ইসলাম শোষণে - শাসনে ও ধর্মীয় সংস্কারের বাঁধনে জর্জরিত অসহায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে কবিতার মাধ্যমে জীবন্ত করে

তুলেছিলেন। তাই তাঁর মুক্তিপ্রয়াস শুধু পরাধীন দেশের জন্যই নয়,পরাধীন মানুষের জন্যও। কাজী নজরুলের বিদ্রোহ মানুষের জন্য, মানুষের প্রতি। সমালোচক দিলীপ সাহার মতে —

"প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহ সচেতনতাই নজরুলকে গণকবি ও অসামান্য লোকপ্রিয় করে তুলেছিল।"[৩৯]

সে জন্যই তাঁর কবিতায় গণচেতনা জাগরণের সদিচ্ছা লক্ষ করা যায়। তাই বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক কাজী আবদুল ওদুদের মূল্যায়নে ওঠে এসেছে "..... he is the only writer of modern Bengal who has specially succeded in touching the Mass mind. The poetry of Nazrul has been one of the contributing factors of that awakening of the masses that we now see about us. From that point of view his historical importance is very great indeed."[৪০]

৪

নজরুলের সমসাময়িক যে সাহিত্যিকের লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল গণচেতনাধর্মী সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় রচনাধারা, তিনি আর কেউ নন, বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় হাসির রাজা, 'পোলাপানাসক্ত' শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে গণচেতনার জাগরণের প্রয়োজনে গণমানসের আর্তিকে আবেগমথিত ভাষায় অথচ তির্যক বাক্যবাণে অন্তরাত্মার বিবেকী চেতনাকে নাড়া দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মানবিক অস্তিত্বের সংকটকে নানাভাবে শিবরাম তুলে ধরেছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭), বাংলা কবিতায় কবি নজরুলের বৈপ্লবিক চেতনার আবির্ভাব, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রভাব, সর্বোপরি নিজের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রতিবাদী-বিপ্লবী মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিবরামের গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায়। এই ধরনের রচনায় মানুষে মানুষে বৈষম্যের মুল কারণ যেমন তিনি সুনির্দিষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তেমনি তার ভয়ঙ্কর পরিণতির করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায় শোষণ ও শাসনের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই তার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিও অনুভব করা যায়। মানুষের অমানবিক এবং বৈষম্যমূলক চরিত্র-প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন এবং সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করে জনমানসে গণচেতনার দ্বারকে প্রশস্ত করে তুলেছেন।

শিবরামের মানুষের বন্ধনমুক্তির তীব্র বাসনা ব্যক্ত করে লেখা "মানুষ" কাব্যগ্রন্থটি যে গণচেতনাধর্মী রচনাকর্ম, সে বিষয়ে 'কবি শিবরাম' উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথমাবধি শিবরাম সংস্কারের অচলায়তনকে ভেঙে মানুষের মুক্ত জীবনের স্বাদ পাওয়ার কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'পাখীর খাঁচা' কবিতায় ও

'আবার তোরা বামুন হ' প্যারডিতে পূর্বেই লক্ষ করা গিয়েছে। মানুষের মধ্যেও তার সুস্পষ্ট অনুরণন শোনা যায় — তবে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। কবির বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসায় ফুটে ওঠে গণচেতনা জাগরণের দীপ্তপ্রয়াস —

রাষ্ট্র - ধর্ম - শাস্ত্র - গুরু - মন্ত্র - তন্ত্রে দিয়া সিংহাসন
ষড়-যন্ত্রে চলিতেছে মানুষের শোষণ - শাসন !
আমি আজ চাহি তার নাম —
কোন যুগে মানুষের জীবনের কেবা দিল দাম ?
কে বলিল উচ্চকণ্ঠে ডাকি,
জীবন কেবল সত্য - শাস্ত্র রাষ্ট্র সব-কিছু ফাঁকি ?

('মানুষের মূল্য', "মানুষ")

একদিকে কবির মতে —

যুগে যুগে নব নব ধর্ম-অধিকারী
মানুষেরে করিল কসাই - কিংবা তারে করিল ভিখারী !

ক্ষুদ্র শিল নোড়ানুড়ি মাটির পুতুল
মানুষ তাহারো কাছে তুচ্ছ, নহে তাহারো সমতুল।

('মানুষের মূল্য', "মানুষ")

অন্যদিকে, —

সহস্রের রক্ত শুষি' একজন পুষ্ট করে দেহ,
ধনীর প্রাসাদ ওঠে ভাঙি' লক্ষ দরিদ্রের গেহ।
দৈন্য-দীর্ণ কক্ষ-মাঝে প্রাণ-জীর্ণ মানুষের দল
জীবন্ত - কবরে করে জীবনের লাগি কোলাহল ! -

('মানুষের মূল্য', "মানুষ")

তাই কবির হৃদয়ার্তির ক্ষোভ অভিমান তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। কুটিল কুৎসিত স্বার্থপরতায় এবং দারিদ্রপীড়িত মেহনতি মানুষের জীবনযন্ত্রণায় মুক্তজীবনের আনন্দ কষ্ট কল্পনাতেও কবি মেনে নিতে পারেন নি, তাই কবিগুরুর আবেদনকে নস্যাৎ করে বলেছেন —

তুমি বলো, ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
অন্ন চাই, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু —
ইহাদের বুকে আশা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই।
আমি বলি, ইহাদের জীবনের কোনো মূল্য নাই !

('মানুষের মূল্য', "মানুষ")

কারণ কবির উপলব্ধিতে—

মানুষের মানুষ শিকারী —
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী।

('মানুষের মূল্য', "মানুষ")

তাই সমালোচক তথা কবি কৃষ্ণ ধর কবি শিবরামের বর্ণিত মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন—

"এই মানুষ কোনো ঔপনিষদিক মানবাত্মা নয়, রক্ত মাংসের মানুষ যাদের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন বিশের দশকের বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম। শিবরাম শ্রমজীবী মানুষের পক্ষেই লিখেছিলেন তাঁর কবিতা। মানুষের শ্রমে নির্মিত যে সভ্যতার ইমারত তাকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত একশ্রেণীর মানুষ যারা পৃথিবীকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এই অসহনীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কবির প্রতিবাদ।"[৪১]

প্রায় একই কথা বলেছেন সমালোচক কমল কুমার দত্ত। তাঁর মতে—"যন্ত্র সভ্যতার অভিশাপ , মানুষের পাশব প্রবৃত্তি, মনুষ্যত্বের অপমান তাঁকে চিন্তিত ও সোচ্চার করে তুলেছে কখনো, কখনো বা 'এই দ্বন্দ্ব এ মোর যৌবন' নিয়ে বিব্রত — 'এরে আমি কেমনে যে সহি!' এই নিয়ে 'মানুষ' ।"[৪২]

শিবরামের কাব্য জীবনের প্রথম থেকেই অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভুতি এবং সমবেদনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর যৌবনের প্রথম দিকে একসময় মানসিক দ্বন্দ্বে র সৃষ্টি হয়েছিল। কবির ভাষায় —

এই দ্বন্দ্ব —এ মোর যৌবন ! .....
এ শুধু এনেছে ব্যথা বিষ-জ্বালা বহি'
আনিয়াছে দুরন্ত কামনা —
তারি সাথে বিশ্বের ভাবনা,
দুদিকে এ করে আকর্ষণ
এরে আমি কেমনে যে সহি!

('এই দ্বন্দ্ব', "মানুষ")

কবির মানসজাত রুদ্রের অমোঘ বাণীতেই জীবনের মননজাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে —

রূপের পূজারী তুই, মানুষের নোস কি পূজারী?
কুৎসিৎ মানুষও যে রে দেবতার চেয়ে মনোহর!
অমৃতের-সুন্দরের তরে যাত্রা তোর নহে নহে আর
দিনু তোরে মানুষ-পূজার অধিকার।

('এই দ্বন্দ্ব', ''মানুষ'')

কিন্তু কবির মানসিক দ্বন্দ্বের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল 'হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ', 'বিধাতার চেয়ে বড়ো', 'তাহাদের সবার সমান' প্রভৃতি কবিতায়। সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিই সমব্যথী কবি —

যারা পথ কাটে, গাড়ি টানে তাড়ি খায়, গায় সারিগান
তাহাদের সবার সমান -

('তাহাদের সবার সমান', ''মানুষ'')

কবির লেখনীতে সাম্যবাদী গণচেতনার কথা বার বার ফুটে উঠেছে। কিন্তু শোষিত-শাসিত শ্রমজীবী মানুষের সুখহীন জীবনের প্রতি বেদনা প্রকাশও যে বিলাসের নামান্তর তা জানাতে কবি দ্বিধা করেন নি —

সভ্যতায় সুখ নাই শত কোটি নর যার পর—
এ ভুবন এত সুখহীন—বেদনাও হেথায় বিলাস!

('তাহাদের সবার সমান', ''মানুষ'')

শ্রমজীবী অসহায় মানুষের জীবনে নববর্ষ কোনো নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে না। সময়ের চাকা যতই পথ অতিক্রম করুক, তাদের জীবনের চাকা অচল, অসার। আর তাই নববর্ষের প্রথম দিনেও কবির কথায় নতুনের উৎসাহ - উৎসার নয়,পুরাতনের গতানুগতিক আবর্তন মাত্র —

সম্মুখে চাহিয়া দেখি - দীনহীন মানুষের দল
চলিয়াছে রাজপথে ক্ষীণকণ্ঠে করি কোলাহল —
জীবনের ভিখারী তাহারা!
আজিকার এপ্রভাত দেয় নাই কিছু মাত্র সাড়া
তাহাদের পুরানো জীবনে;

('কে যেন ডাকিল- 'ওরে যাত্রী', ''মানুষ'')

সেজন্য কবির বিস্ময় —

এ শুধু নূতন পাতা খুলিয়াছে প্রাচীন পঞ্জিকা।

('কে যেন ডাকিল-'ওরে যাত্রী', ''মানুষ'')

শিবরাম আশাবাদী। তাই তিনি এই পৃথিবীর সাম্য -মৈত্রী ও স্বাধীনতার মেলবন্ধনে শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলেন। গণচেতনায় মুখর কবির বলিষ্ঠ ঘোষণায় শোষণ-শাসনহীন গণজীবনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে সেখানে—

সমস্ত মানুষ শুধু নয় - সমস্ত জীবন এক জাতি ;
সমগ্র পৃথিবী এক দেশ ।—
শুধু মানুষের দেশ নয়—মানুষ ও পশুর স্বদেশ।

('আজ হতে শতবর্ষ পরে', ''মানুষ'')

লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে লেখা কবিতাগুলিতে ব্রিটিশ রাজ বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শিবরাম সরাসরি কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গণচেতনা জাগানোই তাঁর লক্ষ ছিল। তাঁর যত ক্ষোভ অভিমান জ্বালা অদৃশ্য বিধাতাকে লক্ষ করে কিংবা নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্নাকারে উপস্থাপনা করে গণচেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়—

''আমাদের কালের সমাজ-ব্যবস্থায় যে সব অবিচার অনাচার অত্যাচার মনে প্রচণ্ড নাড়া দিত, তার বিরুদ্ধেই আমি কলম ধরেছিলাম। ইংরাজের শাসন আমায় তেমন পীড়িত করেনি, যাকে বলে Social Injustice সেই সব—যেমন অব্রাহ্মণদের ওপরে বামুনদের অত্যাচার, প্রজাদের ওপরে জমিদারদের শোষনপেষণ—এ সবেই আমি বেশি অভিভূত হয়েছিলাম। সমাজবাদের ধুমধাড়াক্কা তখনো তেমনটা পড়েনি, সোভিয়েট মুল্লুকে সমাজতন্ত্র পত্তনের নাম গন্ধ বাতাসে ভাসছিল, ঘুণাক্ষরের বার্তায় আসছিল—শুধু তারই সুদূর হাতছানি কাউকে কাউকে যেন উন্মনা করেছে সে সময়। যার আবহে মনে হয়, প্রেমেন লিখেছিল, আমি কবি যত কামারের / কুমোরের / যত ছুতোরের আর ইতরের/ ইত্যাদি (মিস-কোটেশন হয়ে গেল হয়ত বা! যে মেমারি!) প্রত্যাসন্ন যুগের সেই সম্ভাবনার আবছায়াতেই আমার সে সময়ের লেখা যত না। পরে সেই সব ভাব-ভাবনাই ফলাও করে প্রবন্ধাকারে আমি ফলিয়েছি ..... কাজীকেও এই পথে আসতে হয়েছিল শেষপর্যন্ত—তার 'সাম্যের গান' কবিতার যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।''[৪৩]

শুধু কবিতার মাধ্যমেই নয়, গুরুগম্ভীর যুক্তিপূর্ণ তর্ক-বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েও মানবতাবাদী

শিবরাম গণচেতনাকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন — তাঁর পূর্বোক্ত স্মৃতিকথা থেকেই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ''আজ এবং আগামীকাল'' (১৯২৯)-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'' (১৯৪৩)-র প্রকাশক মহাদেব সরকারের ভূমিকা থেকে প্রাবন্ধিকশিবরামের লেখনী শক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। মহাদেব সরকার জানিয়েছেন —

''লেখক শিবরাম চক্রবর্ত্তীর অভিনব প্রবন্ধ-সংকলন 'আজ এবং আগামীকাল' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে তৎকালে প্রগতিবাদী কর্ম্মী ও ভাবুকসমাজ 'আজ এবং আগামীকাল' - এর রচনায় নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল .....।''[৪৪]

১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব ভারতেও পড়েছিল। প্রখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আত্মশক্তি'(২০ ডিসেম্বর ১৯২২)তে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

''রাশিয়ার বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে দেশে আজ একটি প্রবল আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে ধ্বংস কর ঐ মুলধনওয়ালাদের, ধ্বংস কর ঐ জমিদারদের। তাহার বদলে যাহারা খাটিয়া খাইতেছে, মাথার ঘাম পায়ে ঠেলিয়া যাহারা পরিশ্রম করিতেছে, তাহাদিগকে সমস্ত সুখ-সুবিধা দাও। ঐ আন্দোলনের সুর আজ আমাদের এই মরা দেশেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।''[৪৫]

এই 'আত্মশক্তি'তে রুশচর্চা বেশ ভালো ভাবেই হ'ত বলে জানিয়ে দেবব্রত ভট্টাচার্য তাঁর ''সমকালীন বাঙালীর দৃষ্টিতে সোভিয়েত দেশ ১৯১৭-১৯৪৭'' গ্রন্থে লিখেছেন —

''শিবরাম চক্রবর্তী এই পত্রিকাটি এক সময় সম্পাদনা করতেন এবং সরস রচনায় বাঙালীকে মাতিয়ে রাখতেন। রুশ বিপ্লব বাঙালী শ্রমজীবী মানুষের মনে নতুন আন্দোলনের পথে উদ্দীপ্ত করেছিল।''[৪৬]

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলায় রুশবিপ্লবের প্রভাব ও মার্কসবাদী সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। 'ভারতী'তে 'রুশ সাহিত্যের ধারা'য় সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী রাশিয়ার বিপ্লবে সাহিত্যের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'সংহতি' (সাময়িক, প্রথম সংখ্যা ১৩৩০), 'লাঙ্গল' (সাপ্তাহিক, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫), 'গণবাণী' (সাপ্তাহিক, ১২ আগস্ট ১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকায় শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ ও শাসনের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ' (৭ ডিসেম্বর ১৯২০) ও এককভাবে সম্পাদিত 'ধূমকেতু' (সাপ্তাহিক, ১২ আগষ্ট ১৯২২) পত্রিকা দু'টিও স্মরণীয়। 'লাঙ্গলে'র প্রথম সংখ্যা থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত গোর্কির 'মা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'প্রবাসী', 'মালঞ্চ', 'মোহম্মদী', 'তত্ত্ববোধিনী'

প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাও রুশ বিপ্লবোত্তর বাংলায় সাম্যবাদী গণচেতনা জাগরণের পথ প্রশস্ত করেছিল। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বিনয়কুমার সরকার এঙ্গলস কৃত "পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র" বইটি তরুণদের ওয়াকিবহাল করার জন্য অনুবাদ (১৯২৪) করেছিলেন। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ও লেনিন বিষয়ে সেই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই গ্রন্থটি হল প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "লেনিন ও সোভিয়েত" (১৯২৬)। রাশিয়ার বিপ্লবী বলশেভিকদের সমর্থনে বাংলা সাহিত্যে প্রথম লেখনী ধারণ করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী।

১৯২৩ সালে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে 'আত্মশক্তি'র দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর উপর দিয়ে যান। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে শিবরাম চক্রবর্তীকে সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করেন। 'আত্মশক্তি' (৩ জুন ১৯২৭)তে লেখা হয়েছিল —

"আমরা যে লক্ষ্যের কথাই বলি তার গোড়ার কথা হলো বেঁচে থাকা। তাই এ বেঁচে থাকার সঙ্গে ভাত ও রুটির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। আজকালকার আর্থিক জগতে এই ভাত-রুটির সমস্যাকে অনেকে চরম সমস্যা মনে করেন—তাই আমরা পাই Communism-Bolshevism প্রভৃতি। এই 'ism' - এর মূল হল ভাত রুটি সমস্যা। সাহিত্যেও এদের স্থান দিতে হবে।"[৪৭]

শিবরামই রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন 'তারুণ্যের সহজাত' স্পর্ধায়। "মস্কো বনাম পন্ডিচেরি"র (১৩৫৯) ভূমিকায় তিনি বলেছেন —

"এই লেখাগুলি যখনকার, তখন কমিউনিজমের নামগন্ধও এদেশে ছিলনা, (কিছু নামগন্ধই খালি ছিল); মার্কসীয় সাহিত্যেরও আমদানি হয়নি। এই নামমাত্র কমিউনিজম্ সম্বল করে, ঐ-তন্ত্রে ওয়াকিবহাল না হয়েও যে আমি কলম ধরতে পেরেছিলাম তার কারণ সাম্যবাদ আসলে এদেশেরই চারা—বিদেশের কলম নয়। বিদেশে কমিউনিজমের বাস্তব চেহারা যাই হোক না কেন, তার আদর্শবাদী যে রূপ তা ভারতীয় মনেরই অনুরূপ। সাম্যের মূল ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তার অন্তর-গতি আমাদের মনের ফল্গুধারায়। সমস্ত মানুষের সমত্ব আর মানুষের প্রতি মমত্ব—এই বোধের দৃষ্টি এখানে এতই সহজ যে, এর জন্য মার্কসীয় দর্শনের অপেক্ষা রাখে না।"[৪৮]

এপ্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখ্য —

"কার্ল মার্কসের আদর্শে বিশ্বাসী জার অনুশাসনের তিমির বিদারী নব্য রাশিয়ার সমর্থনে লেখা এর অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিই। আর এসব থেকে শিবরামের জীবনদর্শনের একটা পরিচয় আমরা পাই। শুধু তাই নয় এগুলো তাঁর নির্ভীকমনের পরিচায়কও বটে।

সেযুগে রাশিয়া ছিল একরকম একঘরে, সবার কাছে অবিশ্বাস ভয় ও বিদ্রূপের পাত্র। ভারতের তৎকালীন কোন কোন পত্র-পত্রিকায় তো তাকে নিয়ে নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হতো। রাশিয়ার সেই একলা চলার যুগে লেনিনের সমর্থনে তিনি যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ধরেছিলেন—এ বড়ো কম কথা নয়। কতো বড়ো বুকের পাটা ও সত্যনিষ্ঠা থাকলে এ কাজ সম্ভব তা অনুমান করা কঠিন নয়।"[৪৯]

তাই অশোক মিত্র কিছুটা রসিকতার ঢঙে বলেছেন —

"এখন যদি লিখতে যেতেন, পাড়ার লোকে হয়তো পুলিশ ডাকতো, কিংবা নিজেরাই এগিয়ে এসে এই হতচ্ছাড়া বেজন্মা লেখকটাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় বানিয়ে ছাড়তো। শিবরাম চক্রবর্তী মরে বেঁচেছেন।"[৫০]

অথচ সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাধারায় অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের চেতনাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে শিবরাম যে লেখনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা যে তাঁর কথায় 'মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি আর পণ্ডিচেরি নিয়ে মস্করা' নয়, আবার 'সুখ পাঠ্য লাঠালাঠি'ও নয়, অভিনব প্রবন্ধগুলির বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করলেই বোঝা যায়। অবশ্য অশোক মিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন —

"গত ষাট দশকে মস্কোর পরিষঙ্গ বদলে গেছে, পণ্ডিচেরীরও। কিন্তু, শিবরাম চক্রবর্তী এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন যখন, তখনও এই স্থাননামদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছিল নেহাৎই প্রতীকী অর্থে, যুক্তি বনাম ভক্তির বিন্যাস -প্রতিবিন্যাস ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে।"[৫১]

সেজন্য শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তিত মস্কো ও পণ্ডিচেরির জন্য শিবরামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে অনিচ্ছুক। কিন্তু মস্কো ও পণ্ডিচেরির নীতি ও কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন হলেও শিবরামের অভিমতের গ্রহণযোগ্যতা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে । বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনের দুই ভক্ত সাধক নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছাড়াও দুই বিশিষ্ট চিন্তক মহেন্দ্র রায় ও শচীন সেনের লেখনী ধারণের প্রতিবাদে মস্কো তথা লেনিনের প্রায়োগিকমার্কসবাদে সহমত পোষণ করেই শিবরাম বিতর্কিত প্রবন্ধ রচনায় তৎপর হননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে গণচেতনার জাগরণ। সেজন্য তিনি প্রথমেই বলেছেন —

"গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি।"[৫২]

আবার তিনি এও বলেছেন —

"মানুষের জন্য আমি দাঁড়িয়েছি, একথা বললে স্পর্ধার মতো শোনাবে, তা আমি বলিনে; কিন্তু মানুষের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি , এই কথাই আমি বলতে চাই। কাবুলিওয়ালা কেন, ক্যানিবলকেও ছেড়ে উঠতে আমি রাজি নই—তাদের নিয়ে উঠতেই আমি চাই। পাশাপাশি বাস করেও একদল মানুষ আরেক দলকে যে ছেড়ে উঠেছে, এটাই মানুষের লজ্জা—যারা ছেড়ে উঠেচে এবং যাদের ছেড়ে উঠেছে, উভয়েরই ! এইখানেই পশুর কাছে মানুষের পরাজয়।"[৫৩]

একদিকে সমাজের নিম্ন স্তরের সর্বসাধারণের বদ্ধমূল সংস্কারের অচলায়তন ভাঙার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সেই শ্রমজীবী মানুষদের শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদানের প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। শিবরাম বলেছেন —

"আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্লমার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে—পুরানো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি-বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো—আদর্শের দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলবো এই জন্যে যে, তিনি তাঁর কঠোরতর সাধনায়, সবলতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, গুঁড়ির থেকে নূতন করে গড়তে পেরেচেন। এই ভাঙা-গড়ার অনিবার্য ফলে যদি নলিনীবাবুর 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণত্রয়ের বিলোপ' ঘটে থাকে, তবে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।"[৫৪]

আবার একই প্রবন্ধে তিনিই বলেছেন —

"রাশিয়ার কথা ছেড়েই দিই,—রাসলীলায় ভারী কড়াকড়ি—কিন্তু আমেরিকার নূতন সমাজ কাদের সৃষ্টি ? ইউরোপ থেকে যেসব শূদ্রের দল আমেরিকায় চাষবাসের পত্তন করতে গিয়েছিল, তাদের। আদিযুগের আর্যাবর্তেরও সেই একই ইতিহাস। সমাজসৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি—পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন এবং নিছক শোভাবর্ধনের জন্য যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উদয় হয়ে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব। ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে দু'-একটা সঙ্ঘ, আশ্রম বা আড্ডা—বড়ো জোর একটা-আধটা নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরি-মার্কা আধুনিক ব্যাসকাশী।"[৫৫]

আর সেজন্যই তিনি আরও ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

"মস্কোর কথা থাকুক, পণ্ডিচেরির দিকেই তাকাই এখন ! সেখানকার 'নূতন ব্রাহ্মণেরা' 'চিন্ময়লোকে

বীজবপনে' যেমন অত্যধিক সময় নিচ্চেন তাতে অজন্মার ভয় একেবারেই করিনে! রাশিয়ার ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারুন আর নাই পারুন, অন্ততঃ এই দেবভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় - বৈশ্যের এ্যহস্পর্শ যদি কায়েম রাখতে পারেন, তাহলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি ! অন্ততঃ আমরা তো রক্ষে পাই! বেটার লেট দ্যান নেভার !''[৫৬]

শিবরাম মানব সমাজে ধর্মনীতি, অর্থনীতি ও কমিউনিস্টদের কর্মনীতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ রূপরেখা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যুক্তি ও বিন্যাসে তাঁর মতামত গণচৈতন্যকে নাড়া না দিয়ে পারে না। তাঁর কথায়—

''ধর্মগ্রন্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করেনা—তার কারণ এই যে, সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি; কেবল নিজে এ কাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্ত্বকেও বড়ো লোকদের স্বার্থসাধনের এই কাজে সে লাগিয়েচে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্যগণ্ডা থেকে বঞ্চিত থাকবার প্রেরণা পাবে, যে-শাস্ত্র এমন প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে, তারই নাম ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত বলতে গেলে, ধর্মগ্রন্থও এক প্রকার ক্যাপিটাল, একে খাটিয়ে খাওয়া চলে, ভাঙিয়েও কিছুদিন বেশ যায়,—কিন্তু মেরে খাওয়া চলে না। আর মহাপুরুষেরা যে সোস্যালিস্ট নন, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এপথ তত করতালিমুখর নয়। কেবল দিতে জানলেই সোস্যালিস্ট হয় না, নিতে জানাও চাই। মানুষের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায়, কিন্তু সোস্যালিস্টহতে হলে তার চেয়ে শক্ত ষ্টাফ দরকার। দরিদ্রকে যে নারায়ণ বলে সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তার এই নারায়ণত্ব থেকে যে তাকে চিরবঞ্চিত করে, সে-ই হচ্ছে সোস্যালিস্ট।''[৫৭]

শিবরামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি ও ধর্মনীতির স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর মতে —

''অপরকে শোষণ করে কী ভাবে নিজেকে পোষণ করা যায় তারই উপায় বাতলে দেয় অর্থনীতি এবং এই দুষ্কর্মের চক্ষুলজ্জা থেকে যা বাঁচায় তারই নাম ধর্মনীতি।''[৫৮]

আবার কটিউনিস্টদের মূলনীতি তাঁর কথায় —

''আমি যেমন সবার জন্যে তেমনি আমার জন্যে সবাই।''[৫৯]

তার বক্তব্যেও এসেছে শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা —

"একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাসওয়ার—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না। কিন্তু পথের ভিক্ষুক যারা, তাদের হটতে হবেই—চিরদিনই হটতে হয়েচে ; তারপর সেই পথ প্রশস্ত হলে যারা সেই পথে চলবে তারা শ্রেণীযুদ্ধ করে চলবে না, চলবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। এর প্রশস্তিই আজকের লেনিনের মুখে যুদ্ধের শ্লোগান, সে হাঁকছে—Turn to the right and attack. কিন্তু কালকের লেনিনের মুখে শুধুই প্রেমের গান! তাকে লেনিন বলে চেনাই যায় না!"[৬০]

শ্রেণিবদ্ধ পথচলার কথা বললেও একালের সংঘের প্রতি শিবরামের সাবধান বাণী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন —

" সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। সঙ্ঘের যিনি কেন্দ্রমূল তিনি 'ঘ'-ঘ-এ ঘুঘু। বাকী সবাই সঙ্। সঙ্দের নিয়ে যাঁর আরাম তিনিই সঙ্ঘারাম, তাঁর কর্মই হচ্ছে সঙ্ঘীয়দের আত্মার আ-কার লোপ করে দেওয়া; তার ফলে পুরুষরা পরিণত হয় হসন্তে এবং মেয়েরা খণ্ড-ৎ-য়ে। পদাশ্রিত চিহ্নমাত্র—অবশেষ চেহারা দেখলেই পুরুষদের চেনা যায়, মেয়েদের চিনতে হলে কালীয়দমনের পট স্মরণ করতে হবে,—সেখানে শ্রীকৃষ্ণ যেসব যুক্তকর অর্ধনারীর ঈশ্বররূপে বিরাজমান তাঁরাই আধুনিক খণ্ডিতাদের পৌরাণিক রূপ।"[৬১]

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের মহৎ দৃষ্টির পরিচয়ের প্রতি শিবরাম সমর্থন জানিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে যে জাতি-বর্ণগত বিভেদ তা যে অমূলক, বড় বড় বংশধারার মধ্যেই শিবরাম দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে —

"বড় বড় বংশধারা আপনা হতেই মরে আসে; যখনই সে বংশধারা বড় হয়ে ওঠে তারপরেই তার বিনাশের পালা। এক একটি মনুষ্যবংশ মহীরুহের মতো বিস্তৃত হতে থাকে —তার শ্রেষ্ঠ ফলকে উদ্ভিন্ন করার আত্মপর তপস্যা নিয়ে; যখনই সেই ফুল ফুটল বা ফল ধরল তখনই সেই বহুবংশবিস্তৃত বৃক্ষ-জীবনের চরম প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ে গেল,তার একান্ত নিজের যে জিনিষটি জগতকে দেবার ছিল দেওয়া হয়ে গেল, তার কাজ শেষ হলো, দান ফুরোলো তার দাবীও ফুরোলো—চিরকালের মানুষের কাছে চরম কথাটি বলা হয়ে গেল তার, তারপরেই তার পরম সমাপ্তি। সারা দুনিয়ায় ইতিহাস হাতড়াবার দরকার নেই—ঘরের কাছেই ঘরোয়া খবর মিলবে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জনের বংশ নেই—রবীন্দ্রনাথের বেলাও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। যদিচ কোথাও কোনো কোনো প্রতিভাধরের পরেও দু'তিন পুরুষ দেখা গেছে, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে যে প্রতিভার রাজটীকা নেই পরবর্তীদের ললাটে, তাদের কোনোরকমে টিকে থাকা কেবল।"[৬২]

সেজন্য শিবরামের অভিমত —

"যে ব্রাহ্মণরা হিন্দুসভ্যতার মাথা ছিল, তারা এখন টিকি-তে গিয়ে কেন টিকলো—কেবল টিকিতেই নয়, টীকাতেও বটে—তার কারণ বোঝা অতঃপর কঠিন হবে না। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও গেছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতাও গেছে—শক্তি ও মনীষীর অভিজাত্য এখন অব্রাহ্মণের পদতলে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষা ব্রজেন্দ্র শীল, শ্রেষ্ঠ কর্মশক্তি মোহনদাস গান্ধী—দু'জনের কেউই উচ্চবর্ণ নন।"[৬২]

শিবরামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে পরিশেষের অনুসিদ্ধান্তে —

"অতএব হিন্দুকে যদি জাতি হিসেবে বাঁচতে হয়, তাহলে হরিজনদের স্বীকার করতেই হবে, কেবল ছোঁয়াছুঁয়ির আওতায় এনেই নয়, সামাজিক আত্মীয়তার স্বীকরণে—বৈবাহিক আদান-প্রদানে—রক্তের অঙ্গীকারে এক হয়ে। বস্তুত, এই রক্তমিশ্রণের উপরেই উচ্চ হিন্দুর পুনরুজ্জীবন, নব-প্রতিভায়ন নির্ভর করছে। সার্বজনিক একাত্মীয়তা হলো হিন্দুসভ্যতার গোড়ার কথা, তাকে অস্বীকার করে টেকা যদি বা যায়, বাঁচা যায় না।"[৬৩]

শিবরাম 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ?' প্রবন্ধে সমাজের চোখে অন্ত্যজ শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণচেতনা জাগরণের উপর জোর দিয়েছেন। সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ না বলে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলার পক্ষপাতী শিবরাম মনে করেন শাসন ও শোষণে ইংরেজের মতো অতি প্রাচীনযুগের ব্রাহ্মণেরাও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেজন্য তাঁর ব্যঙ্গোক্তি —

"শোষণের জন্যই শাসন—এই সনাতন মূলনীতির মূলাধার ব্রাহ্মণ। শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হলে শাসনকে একটা আদর্শের নামে খাড়া করতে হয়, অতীতকালের ব্রাহ্মণরা ডিপ্লোম্যাসির এই গূঢ়-তত্ত্ব ভালো করেই জানতেন। ভারত যে একদা সভ্য ছিল অর্থাৎ বর্বরতাকেও লজ্জা দিতে পেরেছে—সেকালের বামুনেরাই তার প্রমাণ।"[৬৪]

সে জন্যই শিবরাম নির্দ্বিধায় শূদ্রশক্তির প্রাধান্যকেই গুরত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"তাই, ঘোষণা যদি করতেই হয়, অব্রাহ্মণনির্বিশেষে সবাইকে শূদ্র বলে ঘোষণা করাই ভালো, কেননা শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাত! 'মহত্তর' বললাম বলে কেউ যেন না মনে করেন যে, বামুনদের, জাত হিসেবে, আদৌ, আমি মহৎ বলে মনে করি। কিন্তু মহৎ বলে মানি আর নাই মানি, নিপুণ বলে তাঁদের আমি মানবো। যে-অশ্বমেধের ঘোড়া দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, তার মুখে লাগাম লাগিয়ে ময়লা-টানা গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব না থাক, নৈপুণ্য যথেষ্টই । যে শূদ্র-ভারত একদা বৌদ্ধযুগে আপন আত্মার পূর্ণ প্রকাশকে ধরে রাখতে না পেরে, নিজের কূল ছাপিয়ে, অর্ধেক পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে তার আদর্শের সাম্রাজ্য-

বিস্তার করতে চেয়েছিল, তাকেই আবার অন্ধকূপের মধ্যে টেনে কোণঠাসা করে আনা এবং কেবল ইচ্ছামাত্র তার গতিরোধ নয়, ইচ্ছামতো তাকে দিয়ে ব্রাহ্মণের সমস্ত ময়লা টানানো সামান্য বাহাদুরি নয়। মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে-কৌশলে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করে, মুষ্টিমেয় বামুনের কেরামতি তার চেয়ে একটুও কম নয়। ইংরেজের সম্মুখে আছে সঙ্গীন বন্দুক, কিন্তু বামুনের মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক,—অশুদ্ধ হলেও কিছু যায় আসে না, নিছক বিসর্গের বুলেট দিয়ে যে সাম্রাজ্য আদিযুগ থেকে এ পর্যন্ত সে রক্ষা করেচে, ভূগোলের মধ্যে তার বিস্তার দেখা না গেলেও ভূলোকের দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন করে রইলো। মানুষের দুর্গতির এতদূর গতি আর হয় না।''[৬৫]

সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের উচ্চস্তরে ওঠার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও শিবরামের অভিমত উল্লেখনীয়। তাঁর মতে —

''এ জাতির প্রাণশক্তি যে সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে না, তার কারণ, সামান্য সঙ্কীর্ণ পথেও আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ তার নেই—এইজন্যই কোনদিনই তার নিজেকে জানা ও নিজেকে পাওয়া হলো না। পৃথিবীর কাছেও সে অচেনা থেকে গেল। মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলেই চেতনার ভাণ্ডারে শক্তির সঞ্চয় সম্পূর্ণ হতে থাকে —সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা সমাজের ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে বা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। আমাদের সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সবক'টা পথই রুদ্ধ।''[৬৬]

আবার এর অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদেই সমাজে নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও শিবরামের তির্যক বাক্যবাণে সচেতন হয়ে ওঠে মন —

''আমরা নারীকে বলি দেবী, তাকে সমকক্ষ মানুষ বলে ভাবতে পারিনে। অবশ্য নারীকে আমরা নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে, সবরকম আপদ-বিপদের আঁচ থেকে রক্ষা করেই চলি, কিন্তু আগে খোঁড়া করে রেখে তারপর তাকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়ানোয় দাক্ষিণ্য প্রকাশ পায় না।''[৬৬]

শিবরাম আবার দারিদ্র্যকে নিয়ে ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েও গণচেতনার পথ প্রশস্ত করেছেন। তাঁর মতে—

''আমরা মানুষকে দরিদ্র করে রাখি এবং সেই দরিদ্রকে ডেকে বলি, তুমি নারায়ণ; সেটা তাকে স্রেফ উপহাস! তার দারিদ্র দূর করার চেষ্টা আমাদের নয় — সেটা বজায় রাখাই কায়েমী নারায়ণ সেবার অঙ্গ বলে বোধ হয়।''[৬৬]

মানুষে - মানুষে মিলনের একটি পথের দিগ্‌নির্দেশ করেছেন শিবরাম —

"এইভাবে নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত হাজারো রকমের বাধা। অথচ চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গ যদি সহজ না হয়, অবাধ না হয়, বিচিত্র না হয়, তবে আমাদের সম্পূর্ণতাই বা আসবে কোন্ পথে, সার্থকতাই বা পাবো কোন্ ফাঁকিতে? মিলনের রহস্যই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রহস্য, দেবার ও পাবার ঐ একটিমাত্রই প্রণালী।"[৬৬]

এইভাবেই শিবরাম মানুষে মানুষে সমত্ব ও মমত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গণচেতনাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থে।

উপন্যাসে শিবরামের গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস সবিশেষ উল্লেখ্য। নিজে জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলদর্পী জমিদারের লাগামহীন ক্ষমতার অপব্যবহার, শোষণ ও শাসনের কুৎসিত ভয়ঙ্কর রূপ। তাঁরই নিজের জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখা "জমিদারের রথ" নামক গণচেতনাধর্মী উপন্যাসে শিবরাম চক্রবর্তী এক দুস্থপরিবারের ছেলের সৌভাগ্যবশত জমিদারী লাভ এবং তাঁর নির্মম শাসন ও শোষণের শিকার শুধুমাত্র সাধারণ প্রজাই নয় অধস্তন কর্মচারীও। সেই সঙ্গে অকালে স্ববংশে ধ্বংসের মুখোমুখির ট্রাজিক পরিণতির সার্থক রূপায়ণ সাধিত হয়েছে "জমিদারের রথ" -এ। ব্যক্তিগত জীবনে কৈশোরোত্তীর্ণ শিবরাম চাঁচলের জমিদারের বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের স্বার্থে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। মালদার বিশিষ্ট লেখক কমল বসাক এ সম্বন্ধে জানিয়েছেন —

"ছাত্রাবস্থায় শিবরামের ১৮ বছর বয়সে সে সময় এমন এক ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য তাঁদের পরিবারের সকলকেই চাঁচল ছেড়ে চলে যেতে হ'ল। অবশ্য এর জন্য মূলতঃ দায়ী শিবরাম নিজেই। সেসময় শিবরামের যা ভূমিকা,—তা আজকের দিনে হ'লে তিনি কমরেড শিবরাম নামে খ্যাত হ'তেন। ঘটনাটি হল এই যে—তখনকার দিনে জমিদারের খাজনা ছাড়াও জমিদারের নায়েব, গোমস্তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে গরীব প্রজাদের কাছ থেকে উপঢৌকন নিতেন। শিবরামের অপরাধ—তিনি এর প্রতিবাদ জানালেন। প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে খাজনা বন্ধের ডাক দিলেন। কিন্তু রাজপরিবারের একজন আশ্রিতের ছেলে হয়ে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের খেপাবে-এ কোন রাজাই মেনে নিতে পারেন না। শিবপ্রসাদ তাঁর ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে এ পথ পরিত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু শিবরাম নাছোড়বান্দা।"[৬৭]

"জমিদারের রথে"র জয়স্তর মধ্যে তরুণ শিবরামের ছায়া সুস্পষ্ট। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

"জমিদারের রথের রক্তাক্ত লৌহচক্রের নির্মম নিষ্পেষণ হইতে অসহায় দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করিবার

জন্য সে তাহার সব সহকর্মীদের লইয়া একটি ছোট দল গঠন করিল। এই দলের কাজ হইল সবাইকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করা, তাহাদের সত্ত্ব ও স্বার্থ, অধিকার ও দাবী বুঝিয়া লইতে শেখানো, তাহাদের মাদক দ্রব্য, ভীরুতার ভাব ও অন্যান্য কু-সংস্কার বর্জন করিতে উৎসাহিত করা—মনুষ্যত্বের মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।''[৬৮]

''জমিদারের রথ'' উপন্যাসটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ''সমর্পিতা''নামে পরবর্তী কালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির 'গোড়ায় বলবার' অংশে শিবরাম চক্রবর্তী জানিয়েছেন —

''কৈশোরোত্তীর্ণ প্রথম যৌবনের রচনা আমার এই উপাখ্যানটি প্রায় দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সমসাময়িক, আমার 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র আগেকার উপন্যাস-প্রয়াস। কৈশোরে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার আইন-অমান্য আন্দোলনের মখোমুখি এসে পড়ার কীর্তিকাহিনী নিয়ে আমার 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', আর এটি হচ্ছে কোনো এক কাল্পনিক জমিদারের বিয়োগান্ত জীবনবৃত্তান্ত।''

লেখক কাল্পনিক বলে উল্লেখ করলেও এটি বাস্তব ঘটনার পটভূমিকায় লেখা—চাঁচল রাজস্টেটের দায়িত্বপূর্ণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ভূপেন্দ্রনাথ দাশের কথায় তা জানা যায়। ''চাঁচলের শরৎচন্দ্র'' পুস্তিকায় তিনি জানিয়েছেন —

''শিবপ্রসাদবাবুর পুত্র শিবরাম খুবই স্বাধীনচেতা ছেলে ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগ দিয়া তিনি স্কুল যাওয়া বন্ধ করেন। শরৎচন্দ্রের উপর রাগ করিয়া জমিদারের রথ নাম দিয়া একটি বই লেখেন। তাহাতে শরৎচন্দ্রের নিষ্ঠুরতা এবং যাবতীয় কুকীর্ত্তির কাহিনী লিখিয়া শরৎচন্দ্রকে হেয় এবং ঘৃণ্য চরিত্রের লোক হিসাবে চিহ্নিত করেন। শরৎচন্দ্র এই সব সত্যঘটনার জন্য লোক চক্ষে হেয় হইবার ভয়ে বইটির পাবলিসারকে কিছু অর্থ দিয়া আরও প্রকাশ বন্ধ করেন এবং যতগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে ইংরেজ সরকারের সাহায্যে তাহাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করান।''[৬৯]

শিবরাম শুধুমাত্র এই উপন্যাসে জমিদার শরদিন্দুর মুখোশটি খুলে দিয়ে আসল মুখটির দুর্বল দিকগুলিকে স্পষ্ট করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে গণচেতনা জাগরণের জন্য জনশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতার কথাও ব্যক্ত করেছেন সুকৌশলে। লেখকের কথায় —

''বহুদিনের চিন্তার ফলে জয়ন্ত জনশিক্ষার একটি সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল, কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে নূতন পদ্ধতি খাটাইয়া সে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এই পদ্ধতি অনুসারে প্রচলন করিলে অল্প খরচে ও অল্প সময়ে সমগ্র বাংলার

জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা একান্ত সম্ভবপর ব্যাপার। তাহার জেলাটি শিক্ষা বিষয়ে সব জেলার পিছনে ছিল, জয়ন্তের কেবলই মনে হইল, মাত্র লাখখানেক টাকা পাইলে তাহার শিক্ষা পদ্ধতিটি সমগ্র জেলায় বিস্তৃত করিতে পারে, এবং দশবছরের মধ্যেই শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দুইজন হইতে অন্তত পক্ষে শতকরা ৮২ জন বাড়ানো যায়। এ সম্বন্ধে আঁক কষিয়া জয়ন্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল। তাহার জেলা হইতে জনশিক্ষার বিরাট আন্দোলন সমগ্র বাংলায় ব্যাপক করিয়া নিরক্ষরের দেশ হইতে, কেবলমাত্র যুবকদের অভিযানে, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সর্ববিধ অকল্যাণ দূর করিয়া দেয়, এই বিপুল আশাই জয়ন্তের সর্বচিন্তা সর্বসময় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।''[৭০]

কিন্তু জয়ন্তের আশায় বাধ সাধল জমিদার শরদিন্দুর ম্যানেজার যূথপতি। লেখকের কথায় —

''কিন্তু জনগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া উঠিলে, তাহাদের শোষণ ও শাসন করাটাই যাহাদের ব্যবসা তাহাদের অসুবিধা। তাই যূথপতির দল জয়ন্তের দলকে দু'চোখে দেখিতে পারিত না,—কিসে ইহাদের সহিত চরম শত্রুতা সাধিবার সুযোগ পাইবে কেবল সেই ছল খুঁজিত।''[৭০]

জয়ন্তের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেও গেল। জমিদার শরদিন্দুর বনাঞ্চলে প্রজাদের নিজেদের জমিতে রোপিত গাছ কাটতে হলে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে হুকুম নিতে হত। কয়েকজন প্রজা ঘুষ না দিয়ে গাছ কাটায় যূথপতির নির্দেশে জমিদারের কাছারিতে তাদের চরম অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অযথা অসম্মান ও অত্যাচারে জয়ন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং প্রজাদের অধিকার বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছা মতো গাছ কাটতে বলে। ফলে দুশো জন প্রজা দুশো গাছ কেটে ফেলে কিন্তু যূথপতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। লেখকের কথায় —

''যূথপতির অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য জয়ন্ত সমস্ত প্রজাদের ঘরে ঘরে এই অভয় বাণীর মর্ম প্রচার করিতে লাগিল —

''যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায়ী ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ - কুক্কুরের মত সঙ্কোচ সন্ত্রাসে যাবে মিশে,
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন জানে যে হীনতা আপনার
মনে মনে।''

কিন্তু জয়ন্তের এক জায়গায় ভুল হইল।''[৭১]

কারণ যূথপতিকে কবিতা দিয়ে কিছু করা যাবে না। নানারকম ভাবে ষড়যন্ত্র করে জয়ন্ত ও তার কর্মীদলকে জব্দ করার প্রয়াসী হন। প্রখর বুদ্ধিমান জয়ন্তের উপস্থিত বুদ্ধি ও সৎসাহসের জন্য যূথপতি নিজেই জব্দ হন। উপন্যাসের শেষের দিকেও লক্ষ করা যায় যে জয়ন্তের জনশিক্ষার উপর গুরত্ব প্রদানের মূল কারণই গণসচেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। জয়ন্তের কথায় —

''কেবল জনকতককে শিক্ষার মন্দিরে নিয়ে আসা নয়, শিক্ষাকেই প্রতি জনের ঘরে ঘরে—প্রত্যেক অঙ্গনের চত্বরে নিয়ে যাওয়া—এই ছিল আমার আইডিয়াটা। কেউ যেন শিক্ষার থেকে বাদ না যায়। দেশব্যাপী শিক্ষার আবাদ।''[৭২]

শিবরামের আরেকটি অভিনব গণচেতনাধর্মী উপন্যাস প্রয়াস ''ছেলে বয়সে''। 'সমকাম' ও 'বিপ্লবের মোহ' দুটি বিষয়ের ভয়ঙ্কর পরিণামের প্রতি আলোকপাত করে লেখা উপন্যাসটিতে দেশ সেবার আদর্শ পথের সন্ধান প্রদানের প্রচেষ্টা বর্তমান। উপন্যসটির প্রথম প্রকাশকালে (১৯২৫) শিরোনামের পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে 'কেবলমাত্র অভিভাবকদের জন্য লিখিত'। পরের পৃষ্ঠায় জানানো হয়েছে —

''কেবলমাত্র বয়স্ক পাঠক, ছাত্রগণের অভিভাবক ও চিন্তাশীল সমাজসেবিদিগের জন্য, গ্রন্থকার কর্তৃক ১৩৪ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।''[৭৩]

ঔপন্যাসিকও উপন্যাসটির 'পরিচয় অংশে' জানিয়েছেন —

''আমার মনে হয় আমাদের দেশে দৈহিক মানসিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে ছেলেদের জীবনের সমস্যাটা যত জটিল হয়ে পড়েচে এবং সকলের আন্তরিক সাহায্য দাবী করেচে এমন আর কিছু নয়। এদিকে চিন্তাশীল, দেশকর্মী এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি প্রয়োজন মনে করেছিলাম।''[৭৪]

সেজন্যই লেখক একদিকে ছেলেবয়সে ছাত্রজীবনের ছাত্রাবাসে সমকামের মত ভয়ঙ্কর বিষয়ের অবতারণা করে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে দেশসেবার নামে দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক মোহ'র বিরুদ্ধে গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। শিবরামের মতে —

''বিপ্লবের গুপ্ত পন্থায় আমাদের দেশের মুক্তি কিছুতেই হতে পারে না, এ বিষয়ে সন্দেহের আর এতটুকু অবকাশ নেই ।''[৭৪]

সেজন্যই তিনি উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লবী সুধীরের জীবনের ব্যর্থতাকে সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রায় কুড়ি বছর বয়সী তরুণ অনাথ সুধীর স্কুলের রাস্টিকেটের রাজটীকা নিয়ে বিপ্লবী দুর্জয়ের নেতৃত্বে সহিংস স্বদেশব্রত গ্রহণ করে সি.আই.ডি. অক্ষয় কুমার সাহাকে হত্যা করে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেয়। কিন্তু লেখকের কথায় জেলের মধ্যে —

"সুধীর সারারাত ঘুরে ঘুরে কত কি ভাবতে লাগল,—সে তার অন্তরের মধ্যে বিচিত্র সমস্যার দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। একবার তার মনে প্রশ্ন হল—হত্যা কি ভালো? যতই সে এর জবাব খুঁজছিল, হত্যার বীভৎসতা ততই তার মনের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উত্তেজনার বশে যে এই কাজ করেছিল, এখন ঠাণ্ডা মাথায় সে কথা ভাবতেই তার সর্বাঙ্গ সিটিয়ে উঠল।"[৭৫]

তাই কিছু সময় পরে "সুধীরের মনে হল, তারা বিপ্লবীরা হয়ত ভুলপথে চলেচে। যে কাজ সুন্দর নয়, তা কখনো কল্যাণের কাজ — সত্যের কাজ হতে পারে না। যা প্রকাশ্যে করা চলে না তার মধ্যে নিশ্চয় সৌন্দর্যের দৈন্য আছে। হয়ত তা বিধাতার কাজ নয়।"[৭৬]

অন্যদিকে সতীশ পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অসহায় অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষকে যেমন রোজ সন্ধ্যায় লুকিয়ে নাইট স্কুল খুলে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে দেশের খবরাখবর দিয়ে সচেতন করে তোলে, তেমনই গ্রামবাসীদের অধিকার সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও বিরাট জাতিগঠন করতে পারবে বলে তার ধারণা। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঙ্গে অসীমপ্রাণের ভাণ্ডার সবার কাছে মুক্ত করার শিক্ষাই সে দিতে চায়। সেও "জমিদারের রথে"র জয়ন্তের মতো নিজেদের জমিতে রোপিত গাছ জমিদারের আদেশ অমান্য করে কেটে নিতে বলেছিল। আবার তারই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজারা জমিদারের প্রকাণ্ড বিলের বাঁধ কেটে দেয়, যাতে আবাদী জমিতে বাণের জল আটকে না থাকে। এজন্য অবশ্য সতীশকে বিপদের মুখে পড়তে হয়েছিল। জার্মানীর Wander Vogel দলের মতো তার দলগড়ার সদিচ্ছা ছিল যাতে ফূর্তির সঙ্গে কাজ চলবে। গ্রামের মানুষদের অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই তার মূখ্য উদ্দেশ্য। বিপ্লবের গুপ্তপন্থায় স্বাধীনতা আসবে না বলে সতীশের ধারণা। সে মনে করে সমগ্র জাতিকে বিপ্লবে যোগ দিতে হবে। সে আরও বলেছে —

"সমস্ত মিথ্যার সঙ্গে সমস্ত সত্যের সংঘর্ষ বাধবে। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণের, উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর, পুরুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নারীর, জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীর, মহাজনের বিরুদ্ধে মজুরের বৈধপথে নিজের সত্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়তে হবে।"[৭৭]

আবার সতীশ এও জানিয়েছে —

"সকলের মুক্তির জন্য প্রত্যেকে, এবং প্রত্যেকের মুক্তির জন্য সকলে প্রাণপণ করবে। তারপরেই

সত্য জাতি বিশ্বের কল্যাণে, বিচিত্র সৌন্দর্যের বিপুল মহিমায় নবীন জন্ম নেবে। তার আগে নয়।''[৭৭]

সতীশ মনে করে ''বিপ্লবের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এমন বিশেষ কোনো রূপ নেই। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের অভিযানই হচ্ছে বিপ্লব,—রাষ্ট্র, সমাজে, ঘরে, বাইরে, ধর্মে, কর্মে, শিক্ষায়, সভ্যতায় যেখানেই মিথ্যা মেকি ছেয়ে আছে—বিপ্লবের আগুন তার যে কোণে জ্বলে উঠুক না কেন সব কোণের জঞ্জাল সে সাফ করে মুক্ত করবে।''[৭৭]

যে কথাগুলি ঔপন্যাসিক সতীশের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তিনিও তার সঙ্গে একমত শিবরাম নিজেই বলেছেন—

''ছেলেদের যাদের মনে সত্যিকার দেশসেবার প্রেরণা রয়েচে তারা যাতে সুধীরের মত ভুল পথে গিয়ে নিজের ও আরো দশজনের জীবন ব্যর্থ না করে, সতীশের আদর্শই অনুসরণ করেন ওই আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য।''[৭৮]

এভাবেই শিবরাম তার উপন্যাসদ্বয়ে গণচেতনা জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

নাটকেও গণচেতনার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছিলেন শিবরাম। তাঁর ''যখন তারা কথা বলবে'' (১৯৩০) একাঙ্ক নাটকটি গণচেতনার অনন্য ফসল হিসাবে পরিগণিত হওয়ার দাবী রাখে। সাম্প্রতিককালে প্রাবন্ধিক পল্লব সেনগুপ্ত 'ধর্ম বিদ্রোহী শিবরাম' নিবন্ধে নাটকটিকে 'গণমনস্ক নাটক' বলে অভিহিত করেছেন।[৭৯] আবার সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন —

''শিবরামের সত্যিকারের আবির্ভাব হয় তার একাঙ্ক নাটিকায় - 'যেদিন তারা কথা বলবে' আজকালকার গণসাহিত্যের নির্ভুল পূর্বগামী।''[৮০]

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটিকে 'বঞ্চিত মানুষদের' নিয়ে লেখা বলে চিহ্নিত করেছেন।[৮১] ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য বলেছেন যে একাঙ্কটিতে নাট্যকার ''সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর সচেতন হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।''[৮২] মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, স্তর বিন্যাস, তাতে নিম্নস্তরের মানুষের অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ববোধ যেভাবেই উচ্চশ্রেণির মানুষের অপ্রতিরোধ্য নিয়ন্ত্রণে থাকুক না কেন, সময়ের পরিবর্তনে একদিন তারাও নিজেদের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিবে। নাট্যকার শিবরাম নাটকের শিরোনামেই সেই ইঙ্গিত শুধু দেননি, নাটকের একটি চরিত্র সিদ্ধার্থের মাধ্যমেও সেই কথাকে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাই তরুণ লেখক সোমেশের পকেটমার জিগার প্রতি 'চুরি করে বাঁচার চেয়ে ওর মরাই ছিলো ভালো' এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সিদ্ধার্থ একমত হতে না পেরে বলেছে —

"যেহেতু তারা ছোট লোক ? সেই জন্যই ? তাদের মরতে বলতে তুমি পারো—কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে মনে কোরো না যে, বলে নেবার কেবল তোমাদেরই অধিকার। ধরিত্রী তার প্রত্যেক সন্তানের খাদ্য যুগিয়েচে। কিন্তু পেটে যা ধরে তার ঢের বেশি কতকগুলো মানুষ ভাঁড়ারে ধরে রেখেচে—তাই অনেককে অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু বাঁচবার অধিকার তাদেরো। এবং চোরাইমাল ফিরে পাওয়া আর যাই হোক চুরি করা নয়। ওদের কণ্ঠ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি। ওরা কিছু বলে না; কিন্তু যেদিন তারা কথা বলবে সেদিন এই কথাই তারা বলবে।"[৮৩]

জিগার কণ্ঠেও সাম্যবাদের কথা জুগিয়েছেন নাট্যকার। তাই তার কল্পিত রাজত্বে —

"আর সবই থাকবে। কেবল থাক্‌বে না বড়লোক, আর পুলিশ। সক্কলকে চাষবাস করে খেতে হবে, কেউ টাকা জমিয়ে কি মুনাফা লুটে আর সব ভাইকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে বড়লোক হতে পারবে না।"[৮৪]

পুলিশ না থাকার কারণও স্পষ্ট —

"পুলিশ থাকলেই জেলখানা থাকবে। আর জেলখানা থাকলে—মানুষ যদি কয়েদ থাকে—কয়েদী থাকলেই আবার গোলমাল, সেই সব। আর পুলিশকে বখরা দিতে দিতেই আমাদের সব চলে যায় বাবু।"[৮৪]

আবার রাজ্যশাসনের প্রশ্নে জিগার কল্পনাও সুদূরপ্রসারী —

"প্রত্যেক গাঁয়ে দুটো করে চোর থাকবে। তারা দেখবে কেউ যাতে টাকা না জমায়। লোকে যদি দিন আনে দিন খেয়ে উড়িয়ে দ্যায়, তাহলে আর তার চোরের ভয় কি বাবু ? কিন্তু তার মধ্যে কেউ যদি লুকিয়ে টাকা করে, দেখবেন বাবু চোরের ঠিক টনক নড়েছে। চোর তার পুঁজি হাল্‌কা করে দেবে বাবু, আবার তাকে সবার সমান করে দেবে।"[৮৪]

দুটো চোর রাখার কারণও জিগা পরিষ্কার করে দিয়েছেন —"একটা আরেকটার ওপর নজর রাখবার জন্যেই।"[৮৪]

জিগার কথার মধ্যে অভূতপূর্ব ও অভিনব সাম্যবাদের ধারণা হয়ত-বা 'কল্পনার রাজ্যে' সম্ভব মনে হলেও তার মধ্যে দিয়ে গণচেতনা জাগরণের ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবতাবাদী শিবরামের প্রথম মৌলিক এই নাটকটিতে গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস উপলক্ষে উপস্থাপনা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়। শ্রেণিবৈষম্যমূলক সমাজে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, শিল্পীদের অস্তিত্বের সংকটকেও শিবরাম

তুলে ধরেছেন। রঙ্গমঞ্চের অধিকারী ভূজঙ্গম তরুণ লেখক সোমেশর ''ভবিষ্যৎ'' নাটকটির নামমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে যেভাবে প্রবঞ্চনা করে অর্থের বিনিময়ে লেখকের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে নিজেই নাট্যকার হয়ে উঠায় তৎপর হয়েছেন, তার মধ্যে ধনতন্ত্রবাদী সমাজে শিল্পীর অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থ, মান, যশ ও খ্যাতির আলোতে সোমেশের মতো শিল্পীরা কখনই আসতে পারে না—সে দিকটিকেই শিবরাম তুলে ধরেছেন।

আবার গরিব, দুঃখী, শ্রমজীবী কিছু মানুষের মামুলি অপরাধ কিংবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থানমূলক অপরাধ সমাজের চোখে ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু যারা নীরবে লোকচক্ষুর আড়ালে অজস্র সাধারণ মানুষের স্বার্থকে আত্মসাৎ করে অর্থসংগ্রহে তৎপর তারা কিন্তু সেভাবে শাস্তি পায় না। প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধাকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে বেঁচে যায়। এই নাটকেই সেরকম একজন প্রতিনিধি বর্তমান। তিনি একজন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তার পকেট মারার জন্য জিগাকে জনগণের হাতে মার খেতে হয়। কিন্তু নিজে ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপ করে আত্মসাৎ করেও পুলিশের সাহয্যে জনগণের হাত থেকে বেঁচে জান। যে সমস্ত জনসাধারণ প্রতিবাদ করতে এসেছিলেন তারাই উল্টে মার খেয়েছেন। জিগার তাই খেদোক্তি—

''আমি করলাম চুরি, পুলিশ আমাকেই মারলে। আর ও শালা করল চুরি, পুলিশ লোকের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে ওকে।''[৮৬]

জিগা আরও বলেছে—

''দেখবেন, পুলিশ ওর গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবে না, ওকে বাড়ী পৌঁছে দেবে। বাবু, আমি বহুৎ দেখলাম—ভগবান আর পুলিশ এ বড়লোকের বাঁধা।''[৮৭]

তাঁর আর একটি অসাধারণ গণচেতনাধর্মী নাট্যপ্রয়াস ''চাকার নীচে''। এটি ''যখন তারা কথা বলবে'' একাঙ্কিকার পূর্বে রচিত এবং প্রকাশিত। এই নাটিকাতে মনুবাদী হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে গণচেতনার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অন্যদিকে এই একাঙ্কিকায় সমাজের অসহায় নারীজীবনের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংকটকে তুলে ধরেছেন। সমাজরূপ চাকার নীচে পিষ্ট মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে বাস্তবায়িত করে গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস নাটকটিতে লক্ষ করা যায়। এই বিষয়ে 'নাট্যকার শিবরাম' উপ-অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। শিবরামের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নাটক দুটিতে গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে। সে জন্য কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

লক্ষণীয় বিষয় হল, শিবরাম সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকেই গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায় লেখনী

ধারণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সিরিয়াস রচনাই গণচেতনাধর্মী। তিনি প্রথম থেকে প্রায় সমস্ত রকমের সাহিত্যধারায় বিচরণ করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ রচনাই গণচেতনাধর্মী। কারণ শিবরাম মুক্তিকামী মানুষের বন্ধনের অচলায়তন ভাঙার পূর্ণ সদিচ্ছা মনে প্রাণে পোষন করতেন। তাঁর প্রতিবাদীসত্তার মধ্যেই গণচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর গণচেতনার প্রতিপাদ্য বিষয়ই ছিল মানুষে মানুষে সমত্ব ও মমত্ববোধ। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে এই সমত্ব ও মমত্ববোধক গণচেতনাধর্মী রচনাধারায় যে শিবরাম স্বছন্দ ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন কালক্রমে তাতে ইতি টেনে বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ধারায় নিজেই আকণ্ঠ অবগাহন করেছেন।

যে বলিষ্ঠতা শিবরামের গণচেতনাধর্মী সাহিত্য রচনায় লক্ষ করা যায়, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনার ধারায় একজন সার্থক গণসচেতক সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর সিরিয়াস রচনার অনেকটাই গণচেতনাধর্মী সাহিত্য সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নজরুলের মতো জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও তাঁর সমসময়ে শিবরাম গণচেতনাধর্মী রচনাকে সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় অন্তর্ভুক্ত করে তার বিকাশে যে নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সবদিক থেকে নিপীড়িত জনগণের কথা নানাভাবে উপস্থাপিত করে শিবরাম বাংলা সাহিত্যের গণচেতনাধর্মী সাহিত্যধারাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর সার্থকতা ও স্বতন্ত্রতা।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান-তত্ত্ব ও পদ্ধতি, অধ্যাপক পরিমল চন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা - ১৪০

২। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬ - ১৮৫৬), স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা , তৃতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৭

৩। কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কোলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০০, পৃষ্ঠা - ১৩

৪। বিপ্লবের কথা, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, ওরিয়েন্টাল লংম্যান, কোলকাতা প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ৫৭

৫। গণসংগীত সংগ্রহ, সুব্রত রুদ্র, কোলকাতা প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৯৭ নভেম্বর ১৯৯০

৬। বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা (১৯২৩ - ১৯৭০), ড. দীপক চন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০০১, পৃষ্ঠা - ৯

৭। গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াস, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ১৪

৮। A GREAT BEGINNING / ESSENTIALS OF LENIN, LONDON, 1947, P. - 492

৯। ESSAYS IN SOCIOLOGY, MAX WEBER, ETD BY H.H. GERTH AND C. WRIGHT MILLS, LONDON, 1970, P. - 181

১০। উপন্যাস বীক্ষা বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, কমলকুমার সান্যাল, পপুলার লাইব্রেরী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা - ১৮৮

১১। দেশ, ১৮ জুন ২০০২

১২। মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, জয়া সেনগুপ্তা, ক্যাম্প, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১

১৩। বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঃ মনসামঙ্গল কাব্য, মোহাম্মদ হান্নান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

১৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ২০১

১৫। দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী (সমগ্র), বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ২২৪

১৬। পূর্বোক্ত ১৪ নং, পৃষ্ঠা - ২২৪

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড ১৮০১ - ১৮৮০, সুকুমার সেন, কোলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬, পৃষ্ঠা - ৯৫

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৫

২০। বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিত কুমার ঘোষ, জেনারেল, কোলকাতা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, অষ্টম সংস্করণ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১০৯

২১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, খ্রীষ্টীয় দশম বিংশ শতাব্দী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৩৪৬

২২। THE HISTORY AND CULTURE OF THE INDIAN PEOPLE, R.C. MAJUMDAR, BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY, VOL. - IX , PAGE - 933.

২৩। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৯ নভেম্বর ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ৭১-৭২

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২

২৫। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাঙলা রচনা, যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০১, পৃষ্ঠা - ৭৬২

২৬। পূর্বোক্ত ১৮ নং, পৃষ্ঠা - ১২৬

২৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ ঃ প্রথম পর্ব, ড. শ্রীমন্ত কুমার জানা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা - ৬০৪

২৮। পূর্বোক্ত ২০ নং, পৃষ্ঠা - ১২৭

২৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অষ্টম খণ্ড, বঙ্কিম পর্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী

প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ৮৭২, ৮৭৩

৩০। পূর্বোক্ত ১৪ নং, পৃষ্ঠা - ২৫৩

৩১। শনিবারের চিঠি প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদন রঞ্জন কুমার দাস, পরিবেশক, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২১২

৩২। কবিতা সংগ্রহ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক মণ্ডলী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষুদিরাম দাশ, কনক মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ ও সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৮৮

৩৩। কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এ মুখার্জী এণ্ড কোং., কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৩৭১, পৃষ্ঠা - ৮৯

৩৪। বাংলা সাম্যবাদী কবিতার দুই দশক (১৯২৭ - ১৯৪৭), দিলীপ সাহা, কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৪৭

৩৫। আমি যাঁদের দেখেছি, পরিমল গোস্বামী, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ২৮৪

৩৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড (১৮৯১ - ১৯৪১), সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩০১

৩৭। ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, শিশির কর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ২৮১

৩৮। কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ৮ম মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ২৯

৩৯। পূর্বোক্ত ৩৪ নং, পৃষ্ঠা - ৪৯

৪০। CREATIVE BENGAL, KAZI ABDUL WADUD, CALCUTTA, 1950, PAGE - 12

৪১। বিস্মৃত এক মানুষের কবি (প্রবন্ধ), কৃষ্ণ ধর, কোরক সাহিত্য পত্রিকা বইমেলা ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৮৬

৪২। 'মানুষ' - এর শিবরাম (প্রবন্ধ), কমলকুমার দত্ত, যষ্টি-মধু শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ বর্ষ শুরু ১৩৮৮, শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ, পৃষ্ঠা - ৪২

৪৩। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা - ৩৫১-৩৫২

৪৪। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, শিব্রাম অমনিবাস ৪ শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, ভূমিকা

৪৫। সমকালীন বাঙালীর দৃষ্টিতে সোভিয়েত দেশ ১৯১৭-১৯৪৭, দেবব্রত ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৮৫-১৮৬

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৫।

৪৭। অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মলয় বসু, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ১৬৭

৪৮। পূর্বোক্ত ৪৪ নং

৪৯। শিবরামের জীবনদর্শন (প্রবন্ধ), ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যষ্টি-মধু শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ বর্ষ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা - ৭১-৭২

৫০। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী (প্রবন্ধ), অশোক মিত্র, কোরক সাহিত্য পত্রিকা বইমেলা ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৯

৫১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

৫২। পূর্বোক্ত ৪৪ নং, পৃষ্ঠা - ৯১

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৫

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯২

৫৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৩

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৪ - ৯৫

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৩

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৪

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৫

৬০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৩

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩০

৬২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৫

৬৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৭

৬৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৮

৬৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪১

৬৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪২

৬৭। মালদহের পূর্বসূরী গ্রন্থকার জীবনালেখ্য, কমল বসাক, প্রথম প্রকাশকাল মালদহ বইমেলা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৫

৬৮। সমর্পিতা, শিব্রাম অমনিবাস ১১, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৩৩

৬৯। চাঁচলের শরৎচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ দাশ, মালদা, প্রকাশকাল জুন,২০০১, পৃষ্ঠা - ৬-৭

৭০। পূর্বোক্ত ৬৮ নং, পৃষ্ঠা - ৩৩

৭১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪

৭২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

৭৩। উপন্যাসটির প্রকাশকাল উল্লেখ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিঠি (২৪ পৌষ, ১৩৩২), ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসটির ভূমিকা লেখা প্রসঙ্গে লিখিত মন্তব্যর (৯ ই চৈত্র ১৩৩২) সাল তারিখ দেখে ও বিষয় উপলব্ধি করে সহজেই বোঝা যায় যে এটি তাঁর প্রথম সাহিত্যজীবনেরই ফসল এবং প্রকাশকাল ১৯২৫।

৭৪। 'পরিচয়' অংশ, ছেলে বয়সে,

৭৫। ছেলে বয়সে, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৮০

৭৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮০

৭৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৫

৭৮। তদেব, পরিচয় অংশ

৭৯। ধর্মদ্রোহী শিবরাম, পল্লব সেনগুপ্ত, কথাসাহিত্য, আষাঢ় ১৪১০, পৃষ্ঠা - ১০৬

৮০। কল্লোল যুগ, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, এম.সি.সরকার অ্যা' সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭২, পৃষ্ঠা - ১১৩। নাটকটির নাম ''যখন তারা কথা বলবে''-এর পরিবর্তে

''যেদিন তারা কথা বলবে'' উল্লেখিত হয়েছে।

৮১। সবার যিনি এক বয়সী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা বইমেলা ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৬০

৮২। বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ, ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য, প্রধান পরিবেশকঃ নবগ্রন্থ কুটির, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯৫, পৃষ্ঠা - ২২৭

৮৩। যখন তারা কথা বলবে, শিব্রাম অমনিবাস ১০, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৭৪ - ১৭৫

৮৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৭

৮৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৪